তখন অনেক রাত



সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

TAKHAN ANEK RAT

(A novel full fo mystery)

By

SAIYAD MUSTAFA SIRAJ

প্রকাশক—
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
জুলাই—১৯৬৩

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :
দেবদত্ত নন্দী

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রীতিভাজনেষু





।। এক ।।

টালিগঞ্জ এলাকার মায়াপুরী সিনে স্টুডিওর বিশাল চৌহদ্দির ভিতর একটা লম্বা গড়নের বাড়ি। বাড়িটা আপাতদৃষ্টে দোতলা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেড়তলা বলাই ভাল। নিচের তলাটা ঘুপসি মতো এবং গুদামঘর হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। ওপর তলায় খোলা টানা বারান্দা এবং সারবন্দী ঘর। এই সব ঘর সিনেমা প্রযোজকরা ভাড়া নেন। এমনি একটি ঘর সম্প্রতি ভাড়া নিয়েছেন প্রতিভা পিকচার্স। তাঁদের নতুন ছবিটির নাম 'পাতালে কয়েক দিন'। ছবির স্ক্রিপ্ট মোটামুটি খাড়া করা হয়েছে। প্রথা অনুসারে মহরৎও হয়ে গেছে। আর দু' একদিনের মধ্যে ছবি তোলার কাজ শুরু হয়ে যাবে।

পরিচালক অমিয় বকসীর নাম একসময় বাংলা সিনেমায় সুনিশ্চিত বক্স-অফিস ছিল। প্রতিটি ছবিই হিট। কিন্তু মধ্যে কয়েকটা বছর কোনো অজ্ঞাত কারণে অমিয় বকসী সিনেমা জগৎ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। এক প্রখ্যাত নায়িকার কাছে প্রচণ্ড অপমানিত হয়েই তিনি নাকি সিনেমায় ইস্তফা দিয়েছেন বলে গুজব রটেছিল। কিন্তু গুজব হচ্ছে গুজব। তার কোনো মাথামুণ্ডু থাকে না। আসল ব্যাপার অমিয় বকসী ছাড়া কেউ জানে না।

এতদিন পরে আবার অমিয় বকসী ছবি করতে আবির্ভূত হয়েছেন।

প্রযোজকও পেয়ে গেছেন সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর ছবি হিট করার প্রধান কারণ, সমালোচকদের মতে, নতুনত্বের চমক এবং বাস্তবতা। বাস্তব জীবনকে অবিকল নকল করেও তার মধ্যে একটা নতুনত্বের চমক দিয়ে ভিন্ন মাত্রা এনে দিতেন। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ফুটিয়ে তুলতেন নিপুণভাবে। দর্শকের সঙ্গে ছবির পাত্র-পাত্রীদের একাত্মতা সঞ্চারিত হত। কাজেই তাঁর নতুন ছবি 'পাতালে কয়েক দিন' নিয়ে ইতিমধ্যে পত্র-পত্রিকায় জল্পনা শুরু হয়ে গেছে। এবারও না জানি কি নতুনত্বের চমক ছবিঘরগুলোতে শিহরন ঘটাবে!

সিনে স্টুডিওর ভেতর প্রতিভা পিকচার্সের ওই অফিসঘর প্রতিদিন সকাল দশটার মধ্যে খোলে। এদিন অমিয় বকসী সকাল আটটায় চলে এসেছেন। এত সকালে আসবেন বলে আগের দিন চাবি নিয়ে রেখেছিলেন।

ছবির নায়িকা এখনও ঠিক হয়নি। নতুন মুখ এনে বরাবর যেমন তাক লাগিয়ে দিয়েছেন অমিয় বকসী, এবারও তেমনি ইচ্ছা। সকালে অফিসে এসে এক দঙ্গল ফোটো নিয়ে বসে আছেন—সবই সম্ভাব্য নায়িকাদের। একদফা প্রত্যেকের স্ক্রিন ও ভয়েস টেস্ট হয়ে গেছে। এখন চূড়ান্ত নির্বাচনের অপেক্ষা শুধু।

আজ এত সকালে স্টুডিও নির্জন আর স্তব্ধ। গাছপালায় পাখ-পাখালি ডাকছে। মাথার ওপর পুরনো আমলের শিলিং ফ্যানটা ঘুরছে। অমিয় বকসীর সাদা-কালো উস্কো-খুস্কো চুলগুলো বারবার চোখে এসে পড়ছে। একটার পর একটা ফোটো দেখছেন। একটু আগে স্টুডিও গেটের ধারে ক্যান্টিন থেকে সুরেশ নামে ছেলেটা এক কাপ চা দিয়ে গেছে। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে! তবু চুমুক দিচ্ছেন। কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছেন না বলেই ক্রমশঃ বিরক্ত হয়ে উঠছেন। এমন সময়—

—আসতে পারি?

অমিয় বকসী মুখ তুলে তাকালেন। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে একটি যুবক। চেনা লাগল, কিন্তু মনে করতে পারলেন না কিছু। গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ, কেমন যেন রুক্ষ চেহারা। হাতে স্টীলের বালা। পরনে যেমন তেমন একটা প্যান্ট-শার্ট। স্টুডিওর ভেতরে আজকাল মস্তানদের উপদ্রব হয়। কেউ ছবিতে নামতে চায়, কেউ টাকাকড়ি দাবি করে। তাকে দেখামাত্র অমিয়র মনে দুটো প্রশ্ন এল। এখন অফিস খোলা থাকবে, ও জানল কি করে এবং

দারোয়ান ওকে ভেতরে আসতে দিল কেন। অমিয় বিরক্ত ছিলেন। আরও বিরক্ত হয়ে বললেন—কি চাই?

যুবকটি ভেতরে ঢুকে বলল—পরিচালক অমিয় বকসী দেখছি খুব ব্যস্ত মানুষ!

অমিয় ভুরু কুঁচকে বললেন—কি চাই আপনার?

—আপনাকে।

তার ঔদ্ধত্যে অমিয় অবাক হয়ে গেলেন। তবু শান্ত থাকার চেষ্টা করে বললেন—তার মানে?

যুবকটি টেবিলে হাত রেখে দাঁড়াল। বলল—আপনি নন্দিতা নামে একটা মেয়ের সর্বনাশ করেছেন!

—নন্দিতা! কে সে? অমিয় বকসী রূঢ়স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

—অনেকদিন ধরে তাকে আশা দিয়ে তাকে বাতিল করেছেন। এখন বলছেন কে সে? যুবকটি তার শার্টের বুকপকেট থেকে একটা ছোট ছবি বের করে অমিয়র সামনে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিল।—দেখুন তো এবার, কে নন্দিতা!

অমিয় ছবিটার দিকে চোখ বুলিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন—এমন অসংখ্য মেয়ে সিনেমায় নামতে চায়। যোগ্যতা থাক বা নাই থাক। আপনি কি বলতে চান?

যুবকটি রুক্ষস্বরে বলল—বলতে চাই যে আপনার জন্যই নন্দিতা আত্মহত্যা করেছে গতকাল। আপনি তাকে—

অমিয় খাপ্পা হয়ে বললেন—কে কিসের জন্য আত্মহত্যা করেছে, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? আপনি চলে যান এখান থেকে। নইলে আমি পুলিসে ফোন করব।

যুবক বিকৃতমুখে বলল—তা তো করবেনই। একটা বোকা মেয়ের সর্বনাশ করে সাধু সেজে বসে আছেন! কিন্তু জেনে রাখুন, আপনাকে এই পাপের ফল ভুগতেই হবে। আপনি কিছুতেই রেহাই পাবেন না।

বলে সে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। দরজার পর্দাটা নাড়া খেয়ে দুলতে থাকল। অমিয় সেদিকে চোখ রেখে হতবাক বসে রইলেন। একটা অদ্ভুত স্বপ্ন বলেই মনে হচ্ছিল ব্যাপারটা।

ক্যান্টিনের সেই কিশোর ছেলেটি—সুরেশ এল চায়ের কাপ নিতে। তার

মুখে মিটিমিটি হাসি। বলল—লোকটা কে স্যার? উরে ব্বাস! আর একটু হলেই আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিত সিঁড়ির নিচে।

অমিয় কোনো কথা বললেন না। সেই ছবিটা পড়ে আছে টেবিলের ওপর। ছবিটার দিকে তাকালেন একবার। ছবিটার কথা ভুলে গেছে—হয়তো এখনই আবার ফিরে আসবে। এলে ওকে কৌশলে আটকে রেখে পুলিসে খবর দেবেন। অমিয় অত্যন্ত অপমানিত বোধ করছিলেন।

সুরেশ অমিয়র মুখের ভাব দেখে দমে গিয়েছিল। মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে চায়ের কাপ নিয়ে চলে গেল সে।

নন্দিতার ছবিটা দেখে স্মরণ করার চেষ্টা করছিলেন অমিয়। চেনা-চেনা লাগছে। অথচ কিছুতেই মনে করতে পারছেন না তার কথা। গত দু মাসে অসংখ্য মেয়ে তাঁর কাছে এসেছে। তাঁর ঠিকানা যোগাড় করে বাড়িতেও গেছে। কাউকে কাউকে পাত্তাও দিয়েছেন। কিন্তু এই মেয়েটি—

কিছুক্ষণ পরে প্রযোজক রথীন্দ্র কুশারী এসে হাসিমুখে ঢুকলেন। কি বকসী? সিলেকশান হল?

অমিয় তাকালেন। তারপর মাথাটা সামান্য দুলিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করলেন।

রথীন্দ্র বললেন—তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন ব্রাদার? শরীর খারাপ নাকি?

—না। মানে, ভাবছি—আপাততঃ নায়িকার ব্যাপারটা রেখে অন্যান্য অংশগুলো নিয়ে কাজ শুরু করা যায় নাকি.

সে তুমি ভাই যা ভাল বোঝ, কর! আমার বলার কিছু নেই। রথীন্দ্র হাসতে লাগলেন।—কখনও তো তোমার ব্যাপারে নাক গলাইনি। ঘোড়া তোমার। তুমি তার পিঠে কোনদিক থেকে চাপবে, সেটা তোমার ভাবনা।

অমিয় এতক্ষণে স্বাভাবিকভাবে হাসতে পারলেন।—বুঝলে রথীন? এই স্টুডিওর জাস্ট পেছনে উইলফ্রেড কোম্পানির একটা ক্যান্টিন আছে দেখেছ? বিশাল ক্যান্টিন। কাজেই ওদের কিচেনটাও বিশাল এবং একেবারে মডার্ন গ্যাজেটে সাজানো। প্রকাণ্ড ওভেন। রুদ্র দেখে এসে আমাকে বলেছে। সে নাকি এলাহি কারবার। ওদের বেকারিও আছে। সেই সঙ্গে আইসক্রিম তৈরির মেশিন।

রথীন্দ্র মার্লবরো সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বললেন—তাহলে ভালই তো !

—অ্যামেরিকান সিগারেট কোথায় পেলে বাচ্চু ?

রথীন্দ্রের ডাকনাম বাচ্চু। বললেন—আমার লোক আছে। দুনিয়ার কোন্ দেশের কোন্ ব্র্যাণ্ড চাই বল না।

সিগারেট ধরানোর সময় অমিয়ও বললেন—কে লোক ? আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিও না ? আমার একটা জিনিস চাই। না-সিগারেট নয়। কিছু সাউণ্ড রেকর্ড। ধরো প্লেনের সাউণ্ড, কিংবা ট্রেনের। জাপানের একটা রেকর্ডিং কোম্পানি দারুণ সব রেকর্ড করে।

রথীন্দ্র বলেন—সে এক মহা ধড়িবাজ স্কাউণ্ড্রেল। ডক এরিয়ার ঘাগু।

—কে বল তো ?

—ও ! তোমারও অবশ্য চেনার কথা। কি সব ইলেকট্রনিক গ্যাজেট আনিয়েছিলে যেন একসময় ?

—ক্যামেরা, ফিল্ম এই সব। অমিয় একটু হাসলেন। —আচ্ছা, সেই ছোটু ওরফে সুরেন্দ্র সিং নয় তো ?

রথীন্দ্র খ্যা খ্যা করে হাসলেন।—ওরফে আলিম খান ওরফে গব্বর সিং। বুঝেছি। ব্যাটার নামের শেষ নেই।

—রোগা, ঢ্যাঙা, চিবুকে দাড়ি।

—নাকের কাছে কখনও জড়ুল থাকে, কখনও থাকে না। বলে যাও !

—হুঁ, সেই বটে। তোমার সঙ্গে দেখা হলে একবার আসতে বলবে তো !

রথীন্দ্র মাথা দুলিয়ে হাত বাড়িয়ে ফোটোগুলো নিলেন। দেখতে দেখতে একটা ছবি তুলে বললেন—আরে ! রুবি না ?

—চেনো নাকি ?

—ভীষণ চিনি। এর আগে তো 'পঙ্ক প্রতিমা'য় একটা ছোট্ট রোল করেছে। ভাল। সম্ভাবনা আছে।

ছবিটা অমিয় আলাদা করে রেখে সেই ছোট্ট ছবিটা—নন্দিতা নামে একটি মেয়ের—রথীন্দ্রকে দিয়ে বললেন—দেখ তো, একে চেনো নাকি ?

রথীন্দ্র দেখে এককথায় বললেন—চিনি না।

অমিয় বললেন—ভারি অদ্ভুত ব্যাপার। সওয়া আটটা নাগাদ মস্তান টাইপ একটি ছেলে এসে আমাকে শাসিয়ে গেল। মেয়েটি নাকি—

কথায় বাধা পড়ল। সহকারী পরিচালক সীমন্ত রুদ্র ঢুকে বলল—অমিয়দা, ক্যান্টিন ম্যানেজারের সঙ্গে কথা হয়েছে। কোনো অসুবিধে হবে না। তবে আপনার একবার গিয়ে দেখা দরকার। এখন দশটা বেজে এল প্রায়। ইনফুল অ্যাকশান সব পেয়ে যাবেন।

অমিয় উঠে দাঁড়ালেন।—এস বাচ্চু! যাওয়া যাক।

রথীন্দ্র অনিচ্ছা দেখিয়ে বললেন—আমাকে দেখিয়ে কি লাভ? খামোকা! এই গরমে ওই নরকে—মানে তোমার ছবি 'পাতালে কয়েক দিন'এর পাতালে আমাকে দয়া করে ঢুকিও না ভাই!

সীমন্ত হাসল।—তা একটু গরম হবে দাদা! কিচেন তো! বিরাট বিরাট ওভেন।

রথীন্দ্র খিকখিক করে হেসে বললেন—ওহে অমিয়! শুটিং যে করবে ওখানে—তোমার টেকনিশিয়ানরা ঢুকতে চাইবে তো? নরকদর্শন করার মতো বুকের পাটা দ্বাপরে সেই যুধিষ্ঠির ছাড়া আর দেখেছি কলিযুগে তোমার।

অমিয় শুধু হাসলেন। তারপর সীমন্তের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। খোলা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন—ক্যামেরা এনে ভাল করেছ। কয়েকটা স্টীল নিয়ে দেখা যাবে কেমন আসছে ব্যাপারটা।

মায়াপুরী স্টুডিওর এলাকাটি বিশাল। প্রায় চল্লিশ একর জমি। বেশিটাই বাগান, গাছপালা, পুকুর আর পার্ক। পশ্চিম দিকটায় চারটে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড গোডাউনের মতো স্টুডিও ঘর। ওই দিকটায় একটা প্রদর্শনীভবনও আছে। তা ছাড়া ল্যাবরেটরি, রেকর্ডিং রুম ও কিছু সারাক্ষণের কর্মীর কোয়ার্টার নিয়ে জমজমাট। দক্ষিণে সেই লম্বাটে দেড়তলা বাড়িটা। বাকি পূর্ব ও উত্তর অংশে যে বাগান, পুকুর, পার্ক এবং গাছপালার জঙ্গল, অনেক সময় সেখানেও শুটিং হয়। স্বাভাবিক পরিবেশে আউটডোর শুটিংয়ের ঝামেলা অনেক। মায়াপুরীতে সে-ব্যবস্থাও রয়েছে। এমন কি আস্ত পাড়াগাঁর সেট তৈরি করে সম্প্রতি একটি ছবির শুটিং হয়েছে এদিকটায়।

সীমন্তকে সেদিকে পা বাড়াতে দেখে অমিয় বললেন—ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?

সীমন্ত একটু হেসে বলল—এখান দিয়ে খুব কাছে পড়বে, দাদা! এই শর্টকাট আমিই আবিষ্কার করেছি। আসুন!

অমিয় তাকে অনুসরণ করলেন। ডানদিকে খানিকটা দূরে কিছু লোক ব্যস্তভাবে ফিতে ধরে কি সব মাপজোক করছে। সীমন্ত বলল—'তপোবন' ছবির সেট হচ্ছে। বুঝলেন দাদা? একেবারে রিয়েল তপোবন করে ছাড়বে। কিন্তু বলুন তো দাদা, সে যুগে কি কৃষ্ণচূড়া ছিল? ওই দেখুন, কুটির তৈরি করেছে কৃষ্ণচূড়ার গা ঘেঁষে। কোনো মানে হয়?

সংকীর্ণ খোয়াবিছানো রাস্তার দু ধারে পাম গাছ। বাঁদিকে পুকুরপাড়ে গিয়ে সীমন্ত বলল—ওই যে দেখছেন পাঁচিলের ভাঙা জায়গাটা। ওখান দিয়ে বেরুলেই গিয়ে পড়ব ক্যান্টিনের পেছন দিকে। একটু জঙ্গল হয়ে আছে। তবে অসুবিধে হবে না।

অমিয় চুপচাপ আসছিলেন। একখানে দাঁড়িয়ে বললেন, রুদ্র, ওখানে দেখছি প্রচুর ক্যাকটাস। আমার মাথায় একটা আইডিয়া এল।...থাক। পরে আলোচনা করব। এখন চল, যেখানে যাচ্ছি সেখানেই যাই।

ভাঙা পাঁচিলের ওপর দিয়ে যেতে অসুবিধে হল না। ছবির জন্য অমিয় সবরকম কষ্ট বরদাস্ত করতে রাজি। বরাবর তাঁর এই স্বভাব। অন্য পরিচালক হলে সীমন্তকে বকাবকি করতেন এমন বনবাদাড় আর আবর্জনাসঙ্কুল কুপথে নিয়ে আশার জন্য। সীমন্ত কিছুদিনের মধ্যেই অমিয়কে চিনে ফেলেছে।

উইলফ্রেড কোম্পানির ক্যান্টিন বাড়িটা দোতলা। পেছন দিকটায় খানিকটা লম্বাটে ফাঁকা জায়গা। কোনো আমলে লাইমকংক্রিটে মোড়া হয়েছিল। এখন ফেটেফুটে ঘাস গজিয়ে রয়েছে। সমান্তরালে গভীর খোলা নর্দমা। বাড়িটা ঘুরে সামনের দিকে যেতে যেতে সীমন্ত কিচেনের চিমনি দুটো দেখাল। কিচেনের ব্যাকডোরে একটা উর্দিপরা লোক হাঁ করে তাকিয়ে ছিল দুজনের দিকে। সীমন্ত বলল—ম্যানেজারসাব হ্যায়?

সে তেমনি অবাক চোখে তাকিয়ে মাথা দোলাল।

অমিয় বললেন—ওকে বল না রুদ্র, ম্যানেজারকে খবর দিতে। আমরা এখান দিয়েই তো কিচেনে ঢুকতে পারি মনে হচ্ছে।

সীমন্ত লোকটাকে অমিয়র পরিচয় দিয়ে ছবির শুটিংয়ের কথা বলে মায়াপুরী স্টুডিওর দিকে হাত নেড়ে ব্যাপারটা স্পষ্ট করতেই সে তক্ষুণি অমিয়কে সেলাম দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। সীমন্ত হাসতে হাসতে বলল—সিনেমার যাদু, দাদা! দেখেছি, বিস্তর লোক ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে পড়ে মায়াপুরীতে কিছু ঘটতে দেখলেই। ওই ভাঙা জায়গাটার মিস্ত্রি বুঝতে

পারছেন তো? অনেক সময় ছাদে উঠেও দাঁড়িয়ে থাকে। তবে এবার যা হতে চলেছে, তা এদের লাইফে একটা রীতিমতো ঘটনা।

অমিয় অন্যমনস্কভাবে বললেন—কেন?

—নয়? এতকাল মায়াপুরীর প্রতিবেশী হয়ে থেকেছে। এবার তাদের কিচেনও মায়াপুরীর পার্ট হয়ে যাচ্ছে। সেটা ছবিতে এরা দেখতে পাবে। এ কি সামান্য ব্যাপার এদের কাছে? আমি যে ম্যানেজার ভদ্রলোকের কাছে গেছি, এতক্ষণ সে-খবর রটতে বাকি আছে বুঝি? দেখুন না কি হয়।

অমিয় চিন্তিতভাবে বললেন—ভিড়ের ঝামেলা হলে তো—

কথা কেড়ে সীমন্ত বলল—আচ্ছা দাদা, এক কাজ করলে কেমন হয়? ধরুন, রাতের দিকে যদি শুটিং করা হয়! তাহলে কিন্তু ভিড়টা কম হবে। রাতের শিফটে লোকজন ওদের কারখানায় তত বেশী থাকবে না নিশ্চয়।

—কিন্তু রাতে কিচেনে রান্না-টান্না তো হবে না। ওভেন চালু থাকবে না! আমি চাইছি ইন ফুল অ্যাকশান কিচেন চালু রয়েছে এবং হিরো ওভেনের সামনে কাজে ব্যস্ত। মুখে আগুনের লাল ছটা। ঘাম, যন্ত্রণা, এবং···

সীমন্ত একটু ভেবে বলল—ম্যানেজার আসুক। কথা বলে দেখছি, যদি রাতে কিচেন চালু রাখা যায়।

অমিয়ও ভাবছিলেন। বললেন—ধর, আমরা যদি কোম্পানির নাইট শিফটের লোক এবং আমাদের টেকনিশিয়ান—সবাইকে ডিনার খাইয়ে দিই! মানে, এই ক্যান্টিন থেকেই। খরচ আমাদের।

কিচেনের ব্যাকডোরে একজন তুজন করে উদিপরা একদঙ্গল লোক বেরিয়ে এল। তারপর এলেন ক্যান্টিনের সেই ম্যানেজার। ভদ্রলোক বাঙালী। নাম সত্যসাধন চক্রবর্তী। ব্যস্ত হয়ে বললেন—আসুন, আসুন। এই নোংরা জায়গায় দাঁড়িয়ে কেন? তারপর হাসতে হাসতে বললেন—জানেন তো স্যার, বিলিতি প্রবাদ আছে: খাওয়ার টেবিলে আর রান্নাঘরের মধ্যে পার্থক্যটা হল স্বর্গ আর নরকের।

অমিয় বললেন—শুধু একটুখানি ওই নরকদর্শনই করে যাব মিঃ চক্রবর্তী। পরে সীমন্ত এসে আপনার সঙ্গে কথা বলে যাবে।

—আচ্ছা, আচ্ছা, আসুন!

ভেতরে ঢুকে অমিয় থমকে দাঁড়ালেন। উইলফ্রেড কোম্পানির মালিকরা এখন দেশী লোক। কিন্তু আগের ব্রিটিশ আমলের সবকিছু নিখুঁত বজায়

রাখা হয়েছে তো বটেই, উপরন্তু মডার্ন বিদেশী গ্যাজেটে আরও ভোল ফেরানো হয়েছে। গ্যাস এবং কয়লার ওভেন, প্রকাণ্ড চিমনি, বিশাল সব অ্যালুমিনিয়মের চৌকো পাত্র থেকে ভাপ বেরুচ্ছে। যথেষ্ট গরম কিচেনের ভেতরটা। গলগল করে ঘামছিলেন অমিয়। ওভেনের ঢাকনা খুলছে আর লাল আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে। সীমন্ত ঝটপট করে কিছু ছবি তুলে ফেলল অমিয়র ইশারায়।

ম্যানেজার মিঃ চক্রবর্তী দোতলায় ক্যান্টিন হল এবং তাঁর অফিসে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু তাড়া আছে বলে অমিয় কিচেনের ব্যাকডোর দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

বাইরের আবহাওয়ায় পৌঁছে বড় করে শ্বাস ফেললেন। সত্যি যেন নরকে ঢুকেছিলেন কিছুক্ষণ। এ মুহূর্তে ইচ্ছে করছিল ছবির নাম 'পাতালে কয়েক দিন'-এর বদলে 'নরকে কয়েক দিন' করে দেবেন নাকি। কিন্তু এদেশের দর্শকের কাছে নরক-টরক চালানো কঠিন। তবে এবারকার এই নতুনত্ব দর্শকদের দারুণ চমকে দেবে।

একটু পরে সেই ভাঙা পাঁচিল পেরিয়ে স্টুডিও এলাকায় পৌঁছে অমিয় একটা গাছতলায় দাঁড়ালেন। সিগারেট ধরিয়ে একটু হাসলেন।—বুঝলে রুদ্র? যখন অধ্যাপনা করতুম, আমার সাবজেক্ট ছিল ইংরেজি সাহিত্য। দান্তের 'ইনকার্নো' পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা দিত। কি অসাধারণ বর্ণনা নরকের। যেন চোখের সামনে দেখতে পেতুম ভয়ঙ্কর আগুনের শিখা। অবশ্য আমাদের হিন্দুদের নরক তো আরও ভয়ঙ্কর। আসলে যা বলতে চাইছি, তা হল মানুষ ইহজীবনে পাপ করলে মৃত্যুর পর নাকি নরকের আগুনে জ্বলতে হয় অনন্তকাল। আমার ছবিটা ভেবেছি একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। পাপের জন্য নরকই বরাদ্দ। কিন্তু কেউ কেউ বেঁচে থেকেই নিয়তির কাছে সেই শাস্তি পায়। যন্ত্রণায় তার অস্তিত্ব টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে।

সীমন্ত অবাক হয়ে তাকাল। ছবির বিষয়কে এমন নিজের করে নিয়ে ভাবতে পারেন বলেই হয়ত অমিয় বকসী একসময় জনপ্রিয়তা ও খ্যাতির শীর্ষে উঠতে পেরেছিলেন। তা ছাড়া বিষয়টিও অকল্পনীয়ভাবে নতুন।

অমিয়র মুখে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। বড় করে শ্বাস ছেড়ে বললেন—হ্যাঁ। ঠিক আগুনে পোড়ার যন্ত্রণা। আমার ছবির গল্পে কিচেনের ওভেন থাকবে তারই প্রতীক হয়ে—মানে, নরকের। যাই হোক, রুদ্র, তুমি দেখ আজ বিকেলের মধ্যে ছবিগুলোর প্রিন্ট দিতে পার নাকি। ইতিমধ্যে শুটিংয়ের

ব্যাপারে আমি বাচ্চুর সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি। তারপর তুমি মিঃ চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলে আসবে। একটা ছুটির দিনে সন্ধ্যার পর হলেই ভাল হয়। ওদের লোকজন কম থাকতে পারে সেদিন। ভিড় এড়ানো যাবে।··

অমিয় থাকেন বরানগর এলাকায় গঙ্গার ধারে একটা নতুন ছতলা ফ্ল্যাট-বাড়ির চারতলায়। পশ্চিমের ব্যালকনিতে বসলে গঙ্গা দেখা যায়। স্টুডিও থেকে দুপুরে ফিরে এসে স্নান খাওয়ার পর ছবির স্ক্রিপ্ট নিয়ে বসেছিলেন। সূর্যাস্তের সময় ব্যালকনিতে গেলেন। আজ সারাটা দিন কেমন একটা অন্যমনস্কতা তাকে পেয়ে বসেছে। মন স্থির করে বসাতে পারছিলেন না কোথাও। বারবার সকালের সেই যুবকটি এবং নন্দিতা নামে মেয়েটির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ছবির চেহারাটা মনে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে। মাত্র আঠার-উনিশ বছরের ছিপছিপে গড়নের মেয়ে। মাথায় একরাশ চুল। মুখ-খানি মিষ্টি। একটা সরলতার ভাবও আছে। নিম্নবিত্ত ঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়। তার সঙ্গে তাঁর কখনও চেনাজানা হয়েছিল কি? মাঝে মাঝে চেনা মনে হচ্ছে। আবার ঘুলিয়ে যাচ্ছে। মনেরই ভুল সম্ভবতঃ। ব্যালকনিতে বসে থাকতে থাকতে গঙ্গার ওপারে সূর্য ডুবে গেলে বুক পকেট থেকে ছবিটা আবার বের করলেন। হঠাৎ আবার মনে হল মেয়েটি খুবই চেনা।

সেই সময় সীমন্ত এল প্রিণ্টগুলো নিয়ে। এনেই বলল—দারুণ এসেছে দাদা! কল্পনাতীত!

অমিয় প্রিণ্টগুলো দেখতে ব্যস্ত হলেন। অন্যমনস্কতার দরুণ নন্দিতার ছবিটা পড়ে গিয়েছিল হাত থেকে। একটু হলেই উড়ে গিয়ে নীচে পড়ত। সীমন্ত ঝটপট কুড়িয়ে নিয়ে বলল—কে দাদা? নায়িকা নাকি?

অমিয় গম্ভীরমুখে বললেন—না।

সীমন্তের ক্যামেরার বাতিক আছে। ফোটো তোলা ওর হবি। বলল—তাহলে ছবিটা আমি রাখছি, দাদা। কাজে লাগাব। ফেসখানা দারুণ! বড়ো করে আনলে দেখবেন কি কাণ্ড করে ফেলেছি!

অমিয় আস্তে বললেন—নাও। কিন্তু মেয়েটি নাকি স্যুইসাইড করেছে!

—সে কি! তাহলে তো এটার দাম আরও বেড়ে গেল দাদা!

অমিয়র সকালের ঘটনাটা বলতে ইচ্ছে করছিল না। মনটা তেতো হয়ে যায় মস্তান ছেলেটার কথা ভাবলে। বললেন—ঠিক আছে। বাচ্চুর

সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। কাল দুপুর পর্যন্ত আমি একটু বাইরে থাকছি। স্টুডিওতে যাচ্ছি না। সন্ধ্যার দিকে বরং স্টুডিওতে যাব। তোমার অতক্ষণ থাকার দরকার নেই। নিরিবিলি স্ক্রিপ্ট নিয়ে আবার বসব। কিচেনের সিকোয়েন্সের শট ডিভিসান সেরে ফেলতে চাই। তুমি শুধু একটা কাজ করবে। ক্যামেরাম্যান শ্যামসুন্দরকে বলে রেখো, সে যেন ছ'টা পর্যন্ত অফিসে আমার জন্য অপেক্ষা করে। সে না থাকলে শট ডিভিসান করার অসুবিধে আছে।

অমিয় এখন বিপত্নীক। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। এই ফ্ল্যাটে তাঁর এক দূরসম্পর্কের দিদি থাকেন। তিনি বৃদ্ধা এবং অসুস্থ মানুষ। কাজের লোক বলতে বৃন্দাবন নামে একটি কিশোর আর সোনা নামে মধ্যবয়সি একটি মেয়ে। সোনা সন্ধ্যার পর চলে যায়। সকালে আসে। বৃন্দাবন সারাক্ষণ থাকে। তার বাড়ি মেদিনীপুরের গ্রামে।

সীমন্ত চলে যাবার একটু পরে পারমিতা এলেন। পারমিতা সান্যাল একটি মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা। থাকেন কাছাকাছি সরকারি হাউসিং এস্টেটের ফ্ল্যাটে। অমিয়র সঙ্গে তাঁর পরিচয় পুরনো। বয়স চল্লিশের এদিকে। বত্রিশে বিয়ে করেছিলেন ভালবেসেই। বছর পাঁচেক পরে ডিভোর্স করেছেন ভদ্রলোককে। দেখতে সুন্দরী হলেও শরীরটা একটু মুটিয়ে গেছে। অমিয় ওঁকে ছবিতে নামাতে প্রস্তুত। কিন্তু পারমিতা বলেন, নায়িকা সাজাতে তো পারবে না! কাজেই আর ও লোভ দেখিও না।

অমিয় ব্যালকনিতে চুপচাপ বসেছিলেন। পারমিতা পাশের আসনে বসে বললেন—তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন? কি হয়েছে?

অমিয় একটু হেসে বললেন—আচ্ছা মিতা, একটা কথা মাথায় খালি ঘুরছে সারাদিন। ধর, যে পাপ তুমি দৈবাৎ মোহের বশে কিংবা নিজের অজ্ঞাতসারে করে ফেলেছিলে, তার জন্য তোমার শাস্তি হওয়া উচিত কি না।

—হঠাৎ এ সব কথা কেন?

—না। মানে একটা ছবির আইডিয়া।

—তাই বল। পারমিতা একটু ভেবে বললেন—এটুকু বলতে পারি যে শাস্তি হওয়াটা মোটেও উচিত নয়।

অমিয় একটু খুশি হয়ে সিগারেট ধরালেন। কিছুক্ষণ হালকা চালে কথাবার্তা বলার পর নতুন ছবিটার কথা উঠল। নায়িকা নির্বাচন হয়নি

শুনে পারমিতা ফুট কাটলেন—তুমি কোনোদিনই কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পার না অমু! ওটাই তোমার কেরিয়ারের সেটব্যাক। এ ম্যান অফ ইনডিসিসান!

অমিয় হাসলেন।—ইউ আর রাইট। যেমন তোমার সম্পর্কেও।

পারমিতা ওর কাঁধে মৃদু থাপ্পড় মেরে বললেন—হুঁ! আমি যেন বসে আছি তোমার পথ চেয়ে! ওই কি যেন গানটা--ফাগুনের গান গেয়ে! তারপর প্রথম যুবতীদের মতো খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

অমিয় আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। খ্যাতিমান সিনেমা পরিচালকের পক্ষে যা যা অর্জন করা সম্ভব, একসময় সবই পেয়েছেন। ভোগ করেছেন। ধর্মাধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাননি। উচ্ছৃঙ্খলতা বলা ভুল, তবে একথা ঠিক যে, তাঁর তথাকথিত চরিত্রগুণ বলতে যা বোঝায়, তা ছিল না—মেয়েদের ব্যাপারে। এখন যৌবন স্তিমিত হয়ে এসেছে। মন খুঁজছে ভিন্ন কোনো আশ্রয়। স্বার্থের ঊর্ধ্বে কোনো সম্পর্ক—যা তাকে জীবনের পরম মূল্যে অভিষিক্ত করতে পারবে।

অবশ্য এ ব্যাপারটা তাঁর নিজের কাছেও অস্পষ্ট। শুধু পারমিতাকে দেখলে এতদিন পরে তাঁর মনে এই ধোঁয়াটে আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। জীবনে অন্ততঃ এই একজন নারীর কাছে অমিয় নিজের শরীর নিয়ে পৌঁছুতে চাননি—যেন সাহসে কুলোয়নি। আর পারমিতাও যেন খুব কাছে এসেও দূরের হয়ে থেকেছে। এখন জীবনের প্রায় আসন্ন অপরাহ্নে শরীরটাও বড় ক্লান্ত আর মূল্যহীন লাগে।

—কি ভাবছ?

অমিয় বললেন—কালকের প্রোগ্রামের কথা।

—তাহলে আমি উঠি। বলে ঈষৎ অভিমান দেখিয়ে পারমিতা উঠে দাঁড়ালেন।

কিন্তু অমিয় তাঁকে বাধা দিলেন না। শুধু বললেন—হ্যাঁ। রাত হয়ে যাচ্ছে। দেখ—সাবধানে যেও।

—আমি তো সুন্দরী নায়িকা নই যে পেছনে মস্তান লাগবে! বলে পারমিতা চলে গেলেন।

অমিয় একটু পরে বুঝলেন, পারমিতা রাগ করে চলে গেল। কিন্তু এজন্য নিজের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটল না দেখে নিজেই অবাক হলেন। খুব

ভেতরে যেন একটা ভারসাম্যের অভাব ঘটেছে। অথচ স্পষ্ট করে বুঝতে পারছেন না কেন এই অস্থিরতা।...

'পরদিন সন্ধ্যায় যখন মায়াপুরী স্টুডিওতে প্রতিভা পিকচার্সের অফিসে বসে ক্যামেরাম্যান শ্যামসুন্দর গুপ্তের সঙ্গে আলোচনা করে কিচেন-সিকোয়েন্সের শট ডিভিসান করছেন, তখনও অমিয়র মনে সেই অস্থিরতার তরঙ্গ। রাত সাড়ে আটটা বাজলে শ্যামসুন্দর চলে গেলেন গাড়ি করে। স্টুডিও চত্বর জনহীন। খাপচা-খাপচা আলো পড়েছে এদিকে-ওদিকে। অমিয় গেটের দিকে এগিয়ে ড্রাইভার কমলকে বললেন—তুমি আর একটু অপেক্ষা করো। আমি আসছি।

কমল গেটের কাছ থেকে দেখল, ডিরেক্টরসাব বাগানের দিকে যাচ্ছেন। সে একটু অবাক হল। ওদিকটায় আলো নেই। অমন করে জঙ্গলের দিকে কোথায় যাচ্ছেন উনি?

উইলফ্রেড কোম্পানির কারখানার সকালের শিফট আরম্ভ হয় সকাল ন'টা থেকে। লাঞ্চ পিরিয়ডের বিরতি বেলা বারোটায়। ক্যান্টিন অবশ্য আটটার মধ্যে খুলে যায়। কিচেনে কাজ শুরু হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

ন'টায় সেকেণ্ড বাবুর্চি ইমদাদ খাঁ একবার বলেছিল, কৈ বদ বু নিকালতা হায়। কেউ কান করেনি। হেডবাবুর্চি গঙ্গাধর এসেই বলল—ভেডোবড়ি রাঁধুচি কাঁই রে? নাক-অ না অছি সড়া?

সত্যিই একটা উৎকট গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এদিকটায় প্রচণ্ড ছুঁচোর উপদ্রব। ব্যাকডোরটা জরাজীর্ণ। তলায় ফাটল অনেকটা। ওভেনে ছুঁচো পড়েছে তাহলে! গন্ধটা চামড়া অথবা কাঁচা মাংস পোড়ার। শ্মশানে দাহের সময় এমন গন্ধ নাকে এসে লাগে। কিন্তু অমন নারকীয় আগুনে ছুঁচো পুড়ে ছাই হতে এক মিনিটও লাগার কথা নয়। কেউ কেউ ঠাট্টা করে বলল—কুকুরের রোষ্ট তৈরি করে ইমদাদ খাঁ ন্যাকামি করছে!

ওভেনে কিছু ঢোকা কঠিন। অতএব চিমনির ভেতর সম্ভবতঃ কুকুর ঢুকে রোস্ট হয়ে গেছে। চিমনি দুটো ওভেন থেকে মেঝের সমান্তরালে বেরিয়ে বাইরে গিয়ে খাড়া হয়েছে দেয়ালের সঙ্গে। বাইরের দিকে চিমনির গায়ে তিন বর্গফুট কপাট আছে। খুলে মাঝে মাঝে সাফ করা হয়। কালক্রমে তাপ খেয়ে-খেয়ে ভেতর-ভেতর সেই কপাট জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। গঙ্গাধর হুকুম দিল কপাট খুলে দেখতে।

খুব তেতে আছে চিমনিদুটো। হ্যাঁচকা টানে প্রথমটার কপাট খোলা হল। ছাই জমে আছে। কুকুর-বেড়াল ছুঁচো কিচ্ছু নেই। তারপর দ্বিতীয়টা খুলেই ফাগুলাল নামে কিচেনবয় আঁতকে উঠে 'এ বাপ্' বলে পিছিয়ে এল।

চিমনিটার ভেতর দোমড়ানো একটা মানুষের দেহ-পোশাকপরা। পোশাক থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। মাথার চুল পুড়ে গেছে। দেহের জায়গায়-জায়গায় দাগড়া-দাগড়া লাল-কালো দাগ।

খবর পেয়ে ম্যানেজার সত্যসাধন চক্রবর্তী দৌড়ে এলেন। ততক্ষণে হইচই পড়ে গেছে। ভিড় হয়ে গেছে। মায়াপুরী স্টুডিওর পুকুরপাড়ে শুটিং হচ্ছিল একটা ছবির। ভিড় দেখে সেখান থেকেও অনেকে ভাঙা পাঁচিল ডিঙিয়ে চলে এল। ম্যানেজার মিঃ চক্রবর্তী বীভৎস মৃতদেহটা দেখেই অফিসে ছুটলেন পুলিসকে ফোন করতে।

মুখটা একটু ওপর দিকে ঘুরে আছে মৃতদেহের। মায়াপুরীর এক টেকনিশিয়ান ভিড়ের ভিতর উঁকি মেরে দেখছিলেন। তিনিই চেঁচিয়ে উঠলেন—সর্বনাশ! এ যে অমিয় বকসী মনে হচ্ছে।

প্রথমে কেউ বিশ্বাস করতে পারল না। আরও দুতিনজন ভিড় ঠেলে সাহস করে উঁকি দিলেন। অমিয় বকসীর সঙ্গে বহুকাল তাঁরা কাজ করেছেন। তাঁকে আপাদমস্তক চেনেন।

—হ্যাঁ, অমিয় বকসীই।

সঙ্গে সঙ্গে হইচই স্তব্ধ হয়ে গেল। একজন ভাঙা পাঁচিল পেরিয়ে দৌড়ে গেলেন প্রতিভা পিকচার্সের অফিসে খবর দিতে। মায়াপুরী স্টুডিওর সত্তর বছরের জীবনে এমন অদ্ভুত ঘটনা কখনও ঘটেনি।



॥ দুই ॥

—রান্নাঘর নিয়ে সিনেমা? ভারি অদ্ভুত তো।

—না, ওভেন অর্থাৎ তন্দুর বলতে পারেন। তবে ওটা ছিল ছবির থিম।

—সোজা কথায় উনুনকে কেন্দ্র করে সিনেমা।

ঠিক বলেছেন। উইলফ্রেড কোম্পানির ক্যান্টিনের কিচেনে কিছু ব্রিটিশ যুগের প্রকাণ্ড উনুন আছে। বিলিতি উনুন আর কি! রেলের ইঞ্জিনের চুল্লীর ঢাকনা খুললে যেমন আগুনের হলকা বেরোয়, তেমনি এগুলো থেকেও বেরোয়। 'পাতালে কয়েক দিন' ছবিতে থিমের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন ডিরেক্টর ভদ্রলোক।

—দারুণ আইডিয়া বলা যায়। নতুনত্বের চমক আছে।

—হ্যাঁ, কর্নেল। অমিয় বকসীর প্রত্যেকটি ছবিতে এমনি অদ্ভুত সব চমক থাকত।

—কিন্তু তার ডেডবডি পাওয়া গেছে চিমনির ভেতরে তো? উনুনে নয়?

—ঠিক। পোস্টমর্টেমে মৃত্যুর কারণ বলা হয়েছে, মাথার পেছনে ভোঁতা শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত। বাইরে কোথাও ভদ্রলোককে ওইভাবে মেরে চিমনির ভেতর ঢুকিয়ে রেখেছিল খুনী। শরীরে অনেক জায়গা পুড়ে গিয়েছিল চিমনির ভেতরকার তাপে।

—হুঁ, খুনীর রসবোধ আছে ডার্লিং!

—কেন বলুন তো?

—ছবির নাম শুনে বুঝতে পারছি 'পাতাল' বলতে নরক মিন করছে। ঈশ্বর পাপীদের নরকের আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেন। তাই না? খুনী যেন ঈশ্বরের ভূমিকা নিতে চেয়েছে।

—মাই গুডনেস! এই অ্যাঙ্গলটা তো আমি ভাবিনি।

—অমিয় বকসীর অতীত জীবনেই এই হত্যা কাণ্ডের বীজ খুঁজে পাওয়া সম্ভব, অরিজিৎ! আমার বরাবরকার থিওরি হল, খুনীর পেছনে ছুটোছুটি না করে আগে যে খুন হয়েছে, তার পেছনে ছুটোছুটি করলেই খুনীকে পাওয়া যাবে। তবে তোমরা একালের তদন্ত পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। এ বৃদ্ধের কথা—

—প্লিজ কর্নেল! আমরা বিপন্ন শুধু নই, অত্যন্ত অসহায় বোধ করছি এই কেসে।

—কেন বল তো?

—সিনেমা প্রযোজক রথীন্দ্র কুশারী এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আত্মীয়। শুধু তাই নয়, উনি আমাদের কমিশনার সাহেবেরও ক্লাসফ্রেণ্ড।

—অরিজিৎ, আমি ইদানিং অপরাধ রহস্যের চেয়ে প্রকৃতি রহস্য নিয়ে মেতে উঠেছি। প্রথম কথা, বয়স হয়েছে। গত এপ্রিলে গেছে আমার পঁয়ষট্টিতম জন্মদিন। দাড়ি আরও সাদা হয়েছে। টাক আরও চওড়া হয়ে গেছে। দ্বিতীয় কথা—আজকাল হত্যাকাণ্ড ব্যাপারটাই হয়ে উঠেছে ডালভাত। হত্যাকারীকে আর বুদ্ধি খরচ করতে হয় না। দক্ষতার দরকার হয় না। প্রকাশ্যে অসংখ্য লোকের সামনে সে হত্যা করতে পারে। শাস্তির ভয় করে না সে। ডার্লিং, আমি হয়তো আগের যুগের মানুষ। হত্যাকাণ্ড আমার কাছে দস্তুরমতো একটা আর্ট বলে মনে হয়েছে—নারকীয় আর্ট তো বটেই। শয়তানের শিল্পকলা! শয়তানের প্রকৃত অনুচর সেই সব হত্যাকারীরা আর কোথায়, যাদের সঙ্গে বুদ্ধির জটিল খেলায় নামব? আইনশৃঙ্খলারও সে ছিল এক স্বর্ণযুগ। তাই অপরাধী হওয়া সহজ ছিল না। দস্তুরমতো বুদ্ধিবৃত্তি, চাতুর্য ও নিপুণ ক্ষমতা না থাকলে বিশেষ করে হত্যাকারী হওয়া কঠিনই ছিল। আজ আমার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী দুর্লভ, অরিজিৎ। এ কথায় তুমি আমাকে দাম্ভিক ভাবতে পার। কিন্তু আমি—

—কর্নেল ! প্লিজ, শুনুন। অমিয় বকসীর কেসটা কি তেমন নয় ? আমরা তো হিমশিম খাচ্ছি।

—হুঁ, অমিয় বকসীর খুনী চতুর। তার ঘটে কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে মনে হচ্ছে। বিশেষ করে ডেডবডি চিমনির ভেতরে ঢুকিয়ে রাখার তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ। আচ্ছা অরিজিৎ, চিমনির কপাটে কোনো হাতের ছাপ পেয়েছ কি ?

—পেয়েছি। কিচেনবয় ফাগুলালের। সেই কপাট খুলে ডেডবডি দেখতে পেয়েছিল।

—স্টুডিও এলাকায় খুঁজেছ কি ?

—কোনো সূত্র পাইনি। অমিয়বাবুর ড্রাইভার কমলবাবু বলেছেন, রাত সাড়ে আটটা থেকে ন'টার মধ্যে ডিরেক্টর সাহেব তাকে অপেক্ষা করতে বলে স্টুডিওর বাগানের দিকে যান। তিনি ঘণ্টা দুই অপেক্ষা করে একজনকে নিয়ে খুঁজতে বেরোন। পাত্তা না পেয়ে ফিরে আসেন। গাড়িতেই শুয়ে রাত কাটান। ভোরে বরানগর ফ্ল্যাটে গিয়ে খোঁজ করেন। কিন্তু অমিয়বাবু ফেরেননি। তারপর উইলফ্রেড কোম্পানির কিচেনের চিমনিতে—

—বুঝেছি। খুনীর সঙ্গে তাঁর অ্যাপয়েন্টমেণ্ট ছিল স্টুডিওর বাগানে।

—সেটা আমরাও অনুমান করেছি। যাই হোক, এই কেসে আপনার সাহায্য চাইছি। আপনি বেসরকারি লোক হওয়ার দরুণ আপনার যে সব সুবিধে আছে, আমাদের তা নেই। আপনি পুলিস ডিপার্টের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। কর্নেল, আমি আপনার বরাবরকার এক অনুরাগী ভক্ত। বুড়ো হাড়ে ভেলকির খেলা—না কি বলে যেন, একবার দেখিয়ে দিন প্লিজ।

—আমাকে তাতাচ্ছ ডার্লিং! ওকে। দেখছি কি করতে পারি।···

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার ফোন রেখে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। বাঁ হাতে একটা মাটি খোঁড়ার খুরপি। ছাদে বিচিত্র প্রজাতির সংগৃহীত ক্যাকটাস, অর্কিড, আরও সব গাছের বাগানে ভোরবেলা থেকে পরিচর্যায় ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ পুলিসের ডিটেকটিভ ডিপার্টের ডেপুটি কমিশনার অরিজিৎ লাহিড়ীর ফোন।

একটা শ্বাস ছেড়ে বাথরুমে গেলেন কর্নেল। ভৃত্য ষষ্ঠীচরণকে ডেকে খুরপিটা যথাস্থানে রাখতে বলে কফির হুকুম দিলেন। তারপর হাত ধুয়ে ড্রয়িংরুমের কোণের টেবিলে গেলেন। সচ্ছিদ্র জারের ভেতর রাজস্থানের

মরুপ্রজাপতি দুটো চুপচাপ বসে আছে। জুলাই নাগাদ যদি ডিম প
একটা দারুণ ব্যাপার হবে। আ

রাজস্থানের লোকাস্ট কনট্রোল অ্যাণ্ড রিসার্চ সেন্টারের আমন্ত্রণে গিয়ে এই প্রজাপতি দুটো বাড়তি লাভ হয়েছে। ইচ্ছে আছে, অক্টোবরে আবার একবার ওই অঞ্চলে যাবেন। এদের ব্রিডিং গ্রাউণ্ড খুঁজে বের করবেন।

টুং করে ঘণ্টা বাজল। কেউ বিরক্ত করতে আসছে। কর্নেল ষষ্ঠীকে ডাকার আগেই তার সঙ্গে এক ভদ্রমহিলা ড্রয়িংরুমে হাজির। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। কিন্তু মুখে ও বাকি শরীরে যৌবনের স্পর্ধিত লাবণ্য আছে। তবু এক পলক তাকিয়েই বুঝলেন ওই লাবণ্যের ওপর যেন বিষাদের আবছায়া।

—নমস্কার কর্নেল। আমার নাম পারমিতা সান্যাল।

কর্নেল শান্তভাবে বললেন—বসুন।

পারমিতা সোফার একপ্রান্তে বসে মৃদুস্বরে বললেন—আপনার কথা আমি জয়ন্ত চৌধুরীর কাছে শুনেছি। দৈনিক সত্যসেবকের স্পেশাল রিপোর্টার জয়ন্তকে তো আপনি চেনেন। আপনার অনুচর বলে নিজেকে সে।

—হ্যাঁ। ও তো এখন স্টেটসে আছে। নভেম্বরে ফিরবে লিখেছে।

—জয়ন্ত আমার দূরসম্পর্কের ভাই।

কর্নেল হাসলেন।—তাই বুঝি? তাহলে তো আপনি আমার আপনজন!

—প্লিজ, আমাকে তুমিই বলুন। আমার ডাকনাম মিতা। মিতা বললে খুশি হব।

ষষ্ঠীচরণ কফির ট্রে রেখে গেল। কর্নেল কফির পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে বললেন—তুমি কি কর?

—অধ্যাপনা, মুরলীধর গার্লস কলেজে। পারমিতা কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন। কর্নেল, আমি এসেছি একটা ব্যাপারে। আপনার সাহায্যের আশায়।

কর্নেল তাকালেন। পারমিতার সিঁথিতে সিঁদুর নেই। অবশ্য আজকালকার শিক্ষিকা কালচার্ড বধূদের কেউ কেউ সিঁদুর পরে না। শাঁখা-নোয়া তো দূরের কথা। একটু হেসে বললেন—তোমাকে সাহায্য করতে পারলে খুশিই হব। কিন্তু সমস্যা হল, আমি ইদানিং নিজের কিছু হবির ব্যাপারে এত ব্যস্ত যে বাইরের কিছুতে মন দিতে পারি না। তবু তুমি যখন

দিদি বলে পরিচয় দিয়েছ, তখন তোমার কথায় কান না দিয়ে উপায় বল!

—আপনি কি বিখ্যাত সিনেমা পরিচালক অমিয় বকসীর নাম শুনেছেন?

কর্নেল অবাক হয়ে বললেন—হুঁ। কিন্তু তিনি তো সম্প্রতি খুন হয়েছেন। সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

পারমিতা মুখ নামিয়ে বললেন—আপনাকে বলতে সংকোচ নেই। দের মধ্যে একটা সম্পর্ক ছিল। হয়তো কিছুদিন পরে আমরা বিয়ে তুম। আমি এখনও অবিবাহিতা।

—অমিয়বাবু শুনেছি বিপত্নীক ছিলেন?

—হ্যাঁ। ওর সঙ্গে আমার পরিচয় বহুকালের। বছর দশেক আগে অমিয় রটিশে অধ্যাপনা করত। সেই সময় ও বিয়ে করে এক ভদ্রমহিলাকে। এই হিলা ছিলেন ডিভোর্সি। তাঁর আগের স্বামী সম্পর্কে কিছু জানি না। বয়সে মিয়র চেয়ে কিছু বড়ই ছিলেন। আগের পক্ষের একটি মেয়ে ছিল। তার য়স তখন বছর দশেক। নাম ছিল অপালা। আর তার মায়ের নাম মৃদুলা।

—অপালা কার কাছে থাকত?

—মায়ের সঙ্গে অমিয়র কাছে। ওর দাদামশাই, অর্থাৎ মৃদুলার বাবা কসময় বড়লোক ছিলেন। কিন্তু চরস আর মদে সর্বস্বান্ত হয়ে মারা যান। ার কোনো সন্তানাদি ছিল না। কাজেই বুঝতে পারছেন, অপালাকে কাথাও রাখার জায়গা ছিল না। তবে অমিয় ওকে ভীষণ স্নেহ করত। যাই হাক, তারপর অমিয় সিনেমা করতে নামে। অধ্যাপনা ছেড়ে দেয়। সিনেমায় ব নাম হয় তার। সেই সময় একদিন মৃদুলা আত্মহত্যা করেন স্লিপিং পিল খয়ে। তার কিছুদিন পরে স্কুল থেকে অপালা আর বাড়ি ফেরেনি।

—ইন্টারেস্টিং! তারপর?

—অমিয় অপালাকে ভীষণ স্নেহ করত। গত তিন বছর সে সিনেমা ছেড়ে দিয়েছিল, তার কারণ নিয়ে সিনেমা পত্রিকায় নানারকম গুজব রটেছিল। কিন্তু আসল ব্যাপারটা আমি জানি। সে অপালাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল পাগলের মতো।

কর্নেল চোখ বুজে শুনছিলেন। সোজা হয়ে বসে কফিতে চুমুক দিলেন এবং চুরুট ধরালেন। বললেন—অপালার কোনো আশ্রয় ছিল না বললে। কিন্তু তার বাবা তো ছিলেন!

—ছিলেন নিশ্চয়। কিন্তু আমি তাঁর সম্পর্কে কিছু জানি না। ও
জানলে আমাকে বলত। ।

—এমন তো হতে পারে অপালা তার বাবার কাছে চলে গিয়েছিল। ষে

—হতে পারে। কিন্তু অমিয় তাদের খুঁজে বার করতে পারে
মাসতিনেক আগে সে বরানগরে ফ্ল্যাট নিল আমার কথায়। আগে থা
শ্যামবাজারে। আমার কথায় সে আবার সিনেমা করতে গিয়েছিল। বা
আমি বুঝতুম, একটা কিছু নিয়ে ওর থাকা দরকার। খুব খামখেয়ালী স্বভাব
মানুষ ছিল অমিয়।

—হুঁ। 'পাতালে কয়েক দিন' ছবির গল্পটা কার? ?

—ওর নিজের। স্ক্রিপ্টটা প্রতিদিন একটু করে লিখত আর আমা
শোনাত।...পারমিতা রুমালে ঠোঁট মুছে বলল, এই ছবিটাতে ওর ৫
ইনভলভমেণ্ট দেখে অবাক লাগত আমার।

ছবির গল্পটা কিছুক্ষণ আগে অরিজিতের কাছে ফোনে সংক্ষেপে শুনেে
কর্নেল। এক সংগ্রামী তরুণের উত্থান ও পতনের কাহিনী। একটি ব্য
খানায় সে কাজ করত। মালিক একজন বিধবা সুন্দরী মহিলা। না
প্রেমে তিনি পাগল। তার ফলে নায়ক একদিন উঠে এল ওপরতে
কিন্তু সে মহিলাটিকে ঘৃণা করে। তার প্রেম অন্য একটি কমবয়সী ে
সঙ্গে। কাজেই তাকে আবার পথে নামতে হয়। গল্প হিসেবে খুবই মামু
কিন্তু অমিয় অন্য একটা দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলে
তা ছাড়া একটা প্রচণ্ড চমকও রেখেছিলেন। নায়ক শেষ মুহূর্তে আবিষ্কার
যে তার তরুণী প্রেমিকা অন্য কেউ নয়, সেই মালিক মহিলারই কুমারী বয়ে
পরিত্যক্ত সন্তান। নায়ক অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে আত্মহত্যা করে।
তার প্রেমিকার মায়ের সঙ্গে সে একদা একই শয্যায় শুয়েছে। সেই ক্ষিয়ে
তার নরকের বা পাতালের কয়েকটি দিন।... ‍্যর

কর্নেল বললেন—তুমি আমার কি সাহায্য আশা করছ, মিতা?

পারমিতার চোখ দুটো মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠল। তারপর কয়েক ফে-
জল গড়িয়ে পড়ল। দ্রুত রুমালে চোখ দুটো মুছে বললেন—অমিয়কে এ-
কে খুন করল আমি জানতে চাই, কর্নেল! চ

—শুধু জানতে? কর্নেল স্থিরদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন—র
মিতা? তোমার কি কাউকে সন্দেহ হয়? ান

পারমিতা একটু চুপ করে থেকে বললেন—আপনি বাংলা ছবি দেখেন কি jানি না।

— মাঝে মাঝে দেখি বৈকি।

—এক সময়কার নামকরা হিরো উজ্জ্বলকুমারের সঙ্গে অমিয়র শত্রুতা হল। অমিয়র ছবিতে সে হিরো হতে চাইছিল। কিন্তু তার বয়স প্রায় গ। তা ছাড়া নেশা-টেশা করে চেহারাও নষ্ট করে ফেলেছে। তাকে অমিয় কেন? অমিয়কে সে প্রায়ই শাসাত। বলত, টালিগঞ্জে ঢুকতে দেবে অমিয়র কাছে শুনেছি, তার নাকি হাতে অনেক মস্তান আছে। অমিয় ভয়ও করত ওকে। ঘটনার দিন পাঁচেক আগে, অমিয়র এক অ্যাসিস্ট্যান্ট আমাকে বলেছিল, তাকে উজ্জ্বলকুমার শাসিয়ে বলেছে, তোমার ডিরেক্টরকে পাতালে কয়েক দিন' করতে গিয়ে নিজেই না পাতালে ঢুকে পড়ে। কথাটা অমিযকে বলেছিলুম। অমিয় বলল—'ছেড়ে দাও। মাতালের ় কান দেবার সময় নেই। আর সামন্তটাও ওকে এত ভয় পায়!'

-আমি বললুম—'ভয় তো তুমিও পাও!'

—অমিয় হাসতে হাসতে বলল—'তা পাই। ওকে তো কিছু বিশ্বাস নেই! তবে মার এক তিল ক্ষতি করতে পারবে না। বাচ্চুর সঙ্গে পুলিসের খুব খাতির। বেশী বাড়াবাড়ি করলে বাচ্চুর কানে তুলে দেব। লালবাজার লকআপে তুলবে।'

কর্নেল চোখ বুজে চুরুট কামড়ে ধবে অভ্যাসমতো দাড়ি টানছিলেন।

—হুঁ। অমিয়বাবু আর কোনো শত্রুর কথা বলেছিলেন তোমাকে?

না। আর একটা কথা, ঘটনার একদিন আগে সন্ধ্যার পর গিয়ে ওকে ভীষণ —ই দেখেছিলুম। আমি রাগ করে চলে আসি একটু পরে। এখন মনে হচ্ছে, —অমনস্কতার পেছনে কিছু কারণ ছিল নিশ্চয়। আর তা জানার উপায় রইল না।

—ওই অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর কোথায় থাকেন? ঠিকানা জান?

—সীমন্ত থাকে গড়িয়াহাটের মোড়ে। ওর নিজের একটা সাধারণ স্টুডিও 'মুনলাইট' নাম। তবে ওকে টালিগঞ্জে মায়াপুরীতেও পেয়ে যাবেন।

—প্রডিউসার ভদ্রলোককেও আশাকরি ওখানে পাব?

—হ্যাঁ। ওখানে ওঁদের অফিস আছে।

কর্নেল সোজা হয়ে বসলেন হঠাৎ।—একটা প্রশ্ন করছি। অন্যভাবে নিও আমার এটা জানা দরকার।

পারমিতা চোখ তুলে শান্তভাবে বললেন—বলুন, কর্নেল !

—সচরাচর সিনেমা লাইনে যাঁরা থাকেন, মানে বিখ্যাত ব্যক্তিদের ক বলছি—সুন্দরীদের সঙ্গে তাঁদের প্রচুর যোগাযোগ ঘটে। সেটা স্বাভাবি বটে ! অমিয়বাবুর সঙ্গে—

কথা কেড়ে পারমিতা বললেন—বুঝেছি, আপনি কি বলতে চাইছে সংকোচ করার মানে হয় না। ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, অমিয়কে আমি কখনও সাধু ভাবিনি। জীবনের স্বাভাবিক ধর্মের বাইরে ক'জন যেতে পারে ? ত জানতুম, অমিয়র সঙ্গে অনেকেরই সম্পর্ক ছিল। ও নিয়ে আমি মাথা ঘা নি। মেনে নিয়েছিলুম।

—কোনো বিশেষ নাম উল্লেখ করতে পার ?

পারমিতা একটু ভেবে নিয়ে আস্তে বললেন—নীতা নামে একজন নায়ি আছে। একসময় অমিয় তার ভীষণ অনুরাগী ছিল। আরও একজনের ব জানি। শ্যামলী। সে ক্যাবারে ড্যান্সার। শ্যামলীর জন্য অমিয় একব মার খেয়েছিল। সেকথা এতদিন পরে সীমন্তর কাছে শুনলুম। সীমন্ত ক সন্ধ্যায় আমার কাছে গিয়েছিল।

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন।—হুঁ, অমিয়বাবুর প্রতি অনেকেরই আক্রো থাকা সম্ভব। ঈর্ষাও থাকতে পারে অনেকের—প্রফেশন্যাল জেলাসি আর বি

—তা ছাড়া অসংখ্য নতুন মেয়ে সিনেমায় নামবার জন্য অমিয়র কাছে আস আমি জানি, অমিয় তত কিছু মহাপুরুষ ছিল না। কিন্তু সেজন্য আমি ও দোষ দিই না। লাইনটাই হয়তো এরকম সব সময়। লোভের ফাঁদ পাতা

কর্নেল মনে মনে একটু হাসলেন। হয়তো একেই বলে বিশুদ্ধ প্রেম পারমিতা এত সব জেনেও অমিয়কে ভালবেসে এসেছে। বছরের পর বছ অপেক্ষা করেছে অমিয়কে আইনসম্মতভাবে পাবে বলে। এদিকে বয়স গড়ি এসেছে যৌবনের অপরাহ্নের দিকে। তবু মিলনদিনের প্রতীক্ষা। আশ্চ মানুষের জীবনের এই বাসনাকামর্নার ব্যাপারটা। যাকে ভালবাসি, তা সাতখুন মাফ। তুমি যা কিছু কর, ক্ষতি নেই—শুধু আমার হও। একা পজেসনের মনোবৃত্তি যেন—অধিকার করার গূঢ় বাসনা। এই বাসনারই পি পরোক্ষ প্রকাশ ঘটে সম্পত্তি অর্জনে ?

কর্নেল বললেন—ঠিক আছে। চিন্তা কর না। তবে ব্যাপারা খুবই জটিল মনে হচ্ছে। খড়ের গাদা থেকে সুচ খুঁজে বের করার মতো।

পারমিতা নিজের নাম ছাপানো একটা কার্ড রেখে চলে গেলেন। কর্নেল পেছনে দুটো হাত রেখে পায়চারি করতে থাকলেন। ঠোঁটে কামড়ানো চুরুটটা নিভে গেছে কখন।···

পরদিন উজ্জ্বলকুমারকে পাওয়া গেল মায়াপুরী স্টুডিওতে দক্ষিণ-পূর্ব অংশে বাগানের পেছনে। সেখানে ঘন গাছপালা। 'তপোবন' নামে একটা পৌরাণিক ছবির শুটিং হচ্ছে। উজ্জ্বলকুমারের মাথায় চূড়ো বাঁধা চুল। মুখে প্রকাণ্ড দাড়ি। গলায় রুদ্রাক্ষ। হাতে কমণ্ডলু। পায়ে খড়ম। সাক্ষাৎ ঋষি দুর্বাসা।

রথীন্দ্র কর্নেলের কানে কানে বললেন ওই যে দেখছেন সব সময় কিন্তু নেশায় চুব।

নাচগান হচ্ছিল মুনিকন্যাদের। বারকতক মনিটরিংয়ের পর টেক শুরু হল। উজ্জ্বলকুমার একটা ছাতিমগাছের তলায় সিমেন্টের বেদীতে বসে সিগারেট টানছিল। রথীন্দ্র কাছে যেতেই খিকখিক করে হেসে বললেন—কি বাচ্চুবাবু, অরুণ মোহান্তকে দিয়ে তোমার নরক গুলজার করাবে নাকি?

রথীন্দ্র বললেন—অগত্যা।

—ওয়েট! মোহান্তদাকে আমিই রাজি করিয়ে দেব। কিন্তু একটা শর্তে।

রথীন্দ্র হাসবার চেষ্টা করে বললেন—তোমাকে হিরোর রোলটি দিতে হবে। এই তো?

উজ্জ্বলকুমার রাঙা চোখে আগুন জ্বেলে বললেন—তুমি আমাকে অপমান করছ, বাচ্চু!

—আহা ঠাট্টাও বোঝ না! রথীন্দ্র পকেট থেকে মার্লবরো সিগারেটের প্যাকেট বের করে বললেন—তুমি ফিল্ম ওয়ার্লডের একজন নামী লোক। একসময় তোমার রাস্তাঘাটে বেরুনোর উপায় ছিল না ফ্যানদের গুঁতোর চোটে। তোমাকে ঠাট্টা করব আমি? নাও, অ্যামেরিকান সিগারেট খাও!

উজ্জ্বলকুমার সিগারেট নিলেন। ঋষির দাড়িগোঁফ সাবধানে সামলে ধরে আগের সিগারেটের আগুনে এটা ধরালেন। তারপর বললেন—এখনও কিছু কম নেই। এখনও হিরোর রোল পেলে শালা কত মেয়েছেলের ··

একটা অশ্লীল বাক্য বেরুল। রথীন্দ্র জিভ কেটে বললেন—এই উজ্জ্বল! কি হচ্ছে? আমার সঙ্গে গেস্ট আছেন দেখছ না?

উজ্জ্বলকুমার কর্নেলের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন—উরে ব্বাস! আপনিও কি মশাই আমার মতো ঋষির রোল পেয়েছেন? মোহান্তটা মাইরি ডুবে-ডুবে জল খায়।

কর্নেল ওঁর পাশে বেদীতে বসে পড়লেন হাসিমুখে।

আপনার অভিনয় আমি দেখেছি। আমিও আপনার একজন ফ্যান।

উজ্জ্বলকুমার বললেন—আমার লেটেস্ট ছবি 'বসুন্ধরা'। রাষ্ট্রপতির পদক পেয়েছিলুম। সে বছর আমি দেশের বেস্ট অ্যাক্টর ছিলুম। 'বসুন্ধরা' দেখেছেন কি?

—হুঁউ। কর্নেল মিষ্টি হাসলেন।—উজ্জ্বলবাবু, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

উজ্জ্বলকুমার ভুরু কুঁচকে বললেন—কথা? কি কথা?

—এই ছবিটবি ব্যাপারে আর কি! আমি একটা ছবি করার তালে আছি। তাই—

উজ্জ্বলকুমার সন্দিগ্ধদৃষ্টে একবার রথীন্দ্র একবার কর্নেলকে দেখে নিয়ে তারপর ফিক করে হাসলেন।···বাচ্চু! বুঝে গেছি! অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে। তুমি এ লাইনের পুরনো লোক। আমার কদর বোঝ! ওই অমিয় শালা একেবারে বেলাইন থেকে ছিটকে এসে এখানে ভিড়েছিল। কেন ভিড়েছিল, তাও তো জানি। বুঝলেন মশাই? অমিয় বকসী ছিল বাচ্চুর নতুন ছবির ডাইরেক্টর। এখন সে নরকের পথে রওনা দিয়েছে। আমি পই পই করে বাচ্চুকে বলেছিলুম, ওই শালা মাগীবাজটাকে দিয়ে আর ছবি করিও না। ভরাডুবি হবে।

কর্নেল বললেন—অমিয়বাবু নরকের পথে রওনা দিয়েছে না কি বললেন যেন?

—জানেন না? কাগজে দেখেননি? উজ্জ্বলকুমার খিকখিক করে হাসলেন।—উরে শালা! নরক নিয়ে ছবি করতে যাচ্ছিল। তো তাকেই নরকে ঢুকিয়ে ছেড়েছে। ওই যে দেখছেন কালো কালো চিমনি থেকে ভুসভুস করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, ওর ভেতর অমিয়র ডেডবডি পাওয়া গেছে। মশাই, কোথায় আছেন! কি তুলকালাম হয়ে গেল ওই নিয়ে!

—সর্বনাশ। বলেন কি? কে এমন কাজ করল?

রথীন্দ্র একটু তফাতে 'তপোবনে'র সেটের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ালেন। উজ্জ্বলকুমার চাপা গলায় বললেন—পুলিস স্টুডিওতে এসে ক'দিন ধরে জনে জনে জেরা করেছে। আমাকেও ছাড়েনি। কিন্তু কিছু বলিনি। বোঝেন তো মশাই, আজকাল পরিস্থিতি বড় গুরুতর। কিসে কি হয়ে যায় —কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে। কি দরকার?

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন—ঠিক করেছেন আপনি। খামোকা অন্যের ঝামেলায় জড়িয়ে লাভ কি?

—এক্সজ্যাক্টলি! উজ্জ্বলকুমার গলার স্বর আরও বাড়ালেন।

—নইলে দেখুন, অমিয়শালাব বিস্তর গোপন ব্যাপার আমি জানি! যেমন ধরুন, রুবি নামে উদীয়মানা একটি মেয়ে। অমিয় তার সর্বনাশ করেছে, তারপর ধরুন, ক্যাবারে ড্যান্সার শ্যামলী। শ্যামলীর বস ও বাবা যেমন বাঘা তেঁতুল, তেমনি বুনো ওল। গুণ্ডা লাগিয়ে মেরে ফ্ল্যাট করে দিয়েছিল। এ সব তিন বছর আগের কথা। অমিয় প্রাণের ভয়ে শেষ পর্যন্ত সিনেমা ছেড়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন!

—বলেন কি! আমি তো অমিয় বকসীকে দিয়েই ছবি করাব ভেবেছিলুম।

—বেঁচে গেছেন মশাই! আপনাকে আমি ভাল ডাইরেক্টার ঠিক করে দেব। ইতিমধ্যে কাউকে কথা দেননি তো?

—না। ছবিটা নিজেই করব ভাবছি। আশাকরি আপনার সহযোগিতা পাব।

—খুব ভাল কথা। আমার সমস্ত রকম কো-অপারেশন পাবেন। আই অ্যাসিওর।

—ধন্যবাদ উজ্জ্বলবাবু! কর্নেল চাপা গলায় বললেন—তাহলে অমিয় বকসী দেখছি রীতিমতো লেডিকিলার ছিলেন।

—ওটা মশাই প্রশংসা হল। অমিয় ছিল একটা ঘুঘু লম্পট। উজ্জ্বলকুমার আবার গোপন কথা বলার মুডে ফিরলেন। ফিসফিস করে বললেন—আমার কাছে এমন একটা ডকুমেন্ট আছে, দেখাব'খন। আপনি ফুটবল কোচ অমর্ত্য রায়ের নাম শুনেছেন?

—হ্যাঁ। শুনেছি। এখন উনি তো ইলেভেন টাইগার্স ক্লাবের কোচ।

—তা জানি না। অমর্ত্যের ফিঁয়াসেকে চিনতুন। তার নাম ছিল

মণিদীপা, বুঝলেন ? মণিদীপাকে ছবিতে নামানোর লোভ দেখিয়ে হারামজাদা অমর্ত্য ওর সর্বনাশ করেছিল। ··

উজ্জ্বলকুমার খিকখিক করে হাসলেন। অমিয় অর্মত্যকে যমের মতো ভয় করত। আমার এক শ্যালক সুব্রত ছিল অ্যামেচার ফটোগ্রাফার। স্টুডিওতে এসে ঘোরাঘুরি করত। একদিন আমাকে একটা ফটো দিয়ে বলল, কাণ্ডটা দেখ। ফোটোটা দেখে আমি থ। অমিয় আর মণিদীপা··· খিক্ খিক্ খিক্!

—অশ্লীল কিছু কি ?

—অশ্লীল মানে ? চূড়ান্ত অশ্লীল। সুব্রত শালার আবার এ সব বাতিক ছিল। লুকিয়ে শট নিত। ওই যে পুকুরের ওদিকে ঝোপঝাড় দেখছেন—ওখানকার সিন। ওদের ফলো করে গিয়ে সুব্রত জিনিসটা ক্যামেরায় ধরেছে। যাই হোক, ছবিটা তো নিলুম ওর কাছ থেকে। নেগেটিভটাও হাতালুম। তারপর মশাই, বুঝতেই পারছেন। অমিয় কাত একেবারে। পায়ে ধরতে বাকি—এমন দশা করল। অমর্ত্য দেখলে কি হত ভাবুন!

—হুঁ। তাহলে তো 'পাতালে কয়েক দিন' ছবিতে আপনি একটু চাপ দিলেই নামতে পারতেন!

কথা কেড়ে উজ্জ্বলকুমার বললেন—তা কি ছেড়েছিলুম ভাবছেন ? ওকে বললুম—অ্যাদ্দিন টাকাকড়ি চেয়েছি। এবার টাকাকড়ি নয় ভাই অমিয়, হিরোর রোলটা চাই। শুনে অমিয় মুখ খিস্তি করল। আমি সটান চলে গেলুম অমর্ত্যের বাড়িতে। আমি মশাই সব সইতে পারি। মা বাপ তুলে কথা বললে মাথার ঠিক থাকে না।

—তাহলে অমর্ত্যবাবুকে সব বললেন ?

—হুঁ। আমার মশাই ওই এক জেদ। যা করব ঠিক করেছি, তা করব। অমর্ত্য ছবিটা দেখেই আগুন হয়ে গেল। ও ভীষণ গোঁয়ার। এক সময় নামী খেলোয়াড় ছিল মোহনবাগানে। একেবারে ভিসুবিয়স হয়ে গেল। বলল, আচ্ছা! দেখছি।

—মণিদীপা এখন কোথায় ?

—বোম্বেতে হিন্দি ফিল্মে খুব নাম করেছে। অমর্ত্যর সঙ্গে বিয়েটা কোনো কারণে হয়নি। না হয়ে ভালই হয়েছে। তাহলেও আফ্‌টার অল পুরনো প্রেমিক। অমর্ত্যর ক্ষেপে যাওয়া স্বাভাবিক।

—তাহলে কি আপনার ধারণা অমর্ত্যবাবুই অমিয়বাবুকে—

সেট থেকে ডাক এল সেই সময়। উজ্জ্বলকুমার ব্যাস্ত হয়ে উঠে পড়লেন! —বসুন, এক মিনিটের ব্যাপার। এসে কথা বলছি। বলে দৌড়ে গেলেন।

রথীন্দ্র এতক্ষণে কাছে এলেন।—কি বুঝলেন?

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। একটু হেসে বললেন—খুব গভীর জলের মাছ, অথবা ভীষণ সরল। জীবনে অনেক মানুষ ঘেঁটেছি মিঃ কুশারী, আপনাদের উজ্জ্বলকুমার একটি চরিত্রই বটে।

রথীন্দ্র বলল—ওর সঙ্গে আরও কথা বলার দরকার আছে কি?

—আপাততঃ নয়। আমি এবার সীমন্তবাবুর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

রথীন্দ্র ঘড়ি দেখে বললেন—আশ্চর্য তো! একটা বাজতে চলল, সীমন্ত আজ এখনও এল না। চলুন, ওর মুনলাইটে একবার ফোন করে দেখি; অসুখবিসুখ হল নাকি।

যেতে যেতে কর্নেল বললেন—উজ্জ্বলবাবু এসে খুঁজে না পেয়ে চটে যাবেন।

—সে আমি ম্যানেজ করব'খন। ভাববেন না।

স্টুডিও অফিসে ফোন করলেন রথীন্দ্র।—সীমন্ত? কি ব্যাপার?... অ্যাঁ? বল কি!...ক্যামেরা-ট্যামেরা চুরি যায়নি তো?...শুধু ছবি? কিসের ছবি?...ধুস? ছেড়ে দাও! ভারি তো একটা ছবি—তার জন্য... তোমার পাগলামি! শোনো, এক্ষুণি চলে এস এখানে। জরুরি দরকার আছে। এক ভদ্রলোক তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

ফোন রেখে রথীন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন—রাতে চোর তালা ভেঙে ওর স্টুডিওতে ঢুকেছিল। কয়েকটা ছবি চুরি গেছে। তাই মন খারাপ করে বসে আছে। থানায় গিয়েছিল। পুলিস এসে দেখে গেছে। কিন্তু পাত্তা দেয়নি

দুজনে প্রতিভা পিকচার্সের অফিসে গিয়ে ঢুকলেন। আধঘণ্টা পরে সীমন্ত এল। অত্যন্ত বিষণ্ণ চেহারা। বলল, ভারি অদ্ভুত চুরি। সব কিছু রেখে বেছে বেছে শুধু তিনটে প্রিন্ট আর অরিজিন্যাল ছবি নিয়ে গেছে। ছবিটা আমাকে অমিয়দা দিয়েছিলেন। দারুন ফেস! একমাথা চুলের মধ্যে ডিমালো মুখ, বড় বড় চোখ। এনলার্জে অসাধারণ এসেছিল!

রথীন্দ্র একটু নড়ে উঠলেন। আচ্ছা! তাহলে সেই ছবিটা। অমিয় আমাকে দেখিয়ে বলেছিল—চেনো নাকি। আমি চিনতে পারিনি। তারপর রথীন্দ্র মাথার চুল আঁকড়ে ধরলেন।—মাই গুডনেস! অমিয় সেদিন সকালে

বলছিল কে একটু আগে তাকে শাসিয়ে গেছে! জিজ্ঞেস করতে যাব, তখন কি যেন বাধা পড়ল। ও! সীমন্ত, তুমি এলে ওদের ক্যান্টিনে নিয়ে যেতে। দেখছ? আমার স্মৃতিশক্তি এক্কেবারে গেছে!

কর্নেল বললেন—কে শাসিয়ে গেল বলেননি?

—হ্যাঁ, বলেছিল মনে পড়ছে। এক মস্তানটাইপ ছেলে নাকি শাসিয়ে গেছে। তার সঙ্গে···হ্যাঁ, হ্যাঁ—ওই ছবিটার যোগাযোগের কথাও বলেছিল অমিয়। ছবিটা সম্ভবতঃ সেই এনেছিল। তাই অমিয় বলল, দেখ তো—একে চেনো নাকি।

কর্নেল গুম হয়ে বললেন—তাহলে ছবিটা চুরি যাওয়া তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

—তাই তো দেখছি। আমি যখন ঘরে ঢুকি, তখন অমিয় যেন ওটাই দেখছিল। খুব উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছিল ওকে। জিজ্ঞেসও করেছিলুম? শরীর খারাপ নাকি? জবাব দেয়নি।

কর্নেল সীমন্তের দিকে ঘুরে বললেন—বসুন সীমন্তবাবু। আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।···

পরদিন সকালে কর্নেল ছাদে একটা মেকসিকান ক্যাকটাসের পরিচর্যা করছেন, ষষ্ঠী এসে বলল—ফোং বাবামশাই! নালবাজারের নাহিড়ীসায়েব বললেন শীগগির ডেকে দাও।

—জ্বালাতন! বলে কর্নেল নেমে এলেন ড্রইংরুমে। হাতে যথারীতি খুরপি।—কি খবর অরিজিৎ?

—কর্নেল! আমরা গেছি। ধরাশায়ী একেবারে।

—কি ব্যাপার?

—আবার একটা ডেডবডি। মায়াপুরী স্টুডিওর ভেতর পুকুরের পাড়ে পাওয়া গেছে। মাথার পেছনে ক্ষতচিহ্ন।

—লোকটা কে?

—প্রখ্যাত অভিনেতা উজ্জ্বলকুমার।

—ও গড! খুনী এ কি শুরু করেছে! যাই হোক, তুমি এক্ষুণি চলে এস অরিজিৎ।

কর্নেল ফোন রেখে ধুপ করে বসে পড়লেন সোফায়। চোখ বুজে বললেন—ষষ্ঠী! খুরপিটা রেখে আয়।···



।। তিন ।।

অরিজিৎ লাহিড়ী বললেন—উজ্জ্বলকুমারের ডেডবডি মর্গে পাঠিয়ে লালবাজারে জরুরি কনফারেন্স সেরে তবে আপনাকে ফোন করেছি। কমিশনার সায়েব খাপ্পা। বলছেন, অমিয় বকসীর মার্ডারের পর কেন মায়াপুরী স্টুডিওর ওপর নজর রাখা হয়নি? ওঁর ধারণা, খুনী স্টুডিওর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো লোক। কিন্তু ব্যাপারটা একবার কল্পনা করুন কর্নেল! একটা বিশাল সিনে স্টুডিও। সেখানে অসংখ্য ছবি হচ্ছে। অসংখ্য লোক কাজ করছে! যাতায়াত করছে। প্রত্যেকের দিকে নজর রাখতে হলে সারা ভারতের আই. বি.র লোক এনে জড়ো করতে হয়।

কর্নেল বললেন—উজ্জ্বলবাবুর বডি প্রথম কার চোখে পড়ে? বডিটা কোথায় পড়েছিল?

—গোড়ার কথাটা আগে বলে নিই। কাল রাত্তির এগারোটা অব্দি 'তপোবন' ছবির শুটিং হয়েছে। যতক্ষণ দিনের আলো ছিল, তখন বাইরে বাগানের ওখানে, তারপর স্টুডিওর দু'নম্বর ফ্লোরে। ক্যান্টিনে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। উজ্জ্বলকুমারকে শেষ দেখা গেছে রাত ন'টা নাগাদ। ক্যান্টিনে খেয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিলেন। তাঁর কাজ দিনেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তবু বাড়ি যাননি। ভোর ছ'টা নাগাদ স্টুডিওর একজন মালি বাগানে সিডবেড দেখতে যায়। তারই চোখে পড়ে। পুকুরের পশ্চিমপাড়ে বডিটা পড়েছিল।

—উজ্জ্বলবাবুর বডি সার্চ করেছ আশাকরি?

—করা হয়েছে। সিগারেটের প্যাকেট, গাঁজার পুরিয়া, একটা লাইটার,

নগদ ষাট টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা পাওয়া গেছে। আর একটা এক হাজার টাকার বেয়ারার চেক। কিন্তু চেকটা ব্যাংক থেকে ফেরত দেওয়া। সঙ্গে স্লিপ আঁটা আছে ঃ পেমেন্ট ইজ পোস্ট্‌পনড বাই দা ডিপজিটার। যিনি চেক দিয়েছেন, তিনিই ব্যাংককে টাকা দিতে বারণ করেছেন।

—কোন্ ব্যাংক ?

—ফেডারেল ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া। শ্যামবাজার ব্রাঞ্চ। চেকের সই দেখে নাম পড়া যায়নি।

—এখনই ব্যাংকে খোঁজ নাও, ডিপজিটার কে এবং কোথায় থাকে। আর—

অরিজিৎ চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালেন। বলতে চাইলেন, উজ্জ্বলকুমার একজন অভিনেতা। খ্যাতি কমলেও নানা ছবিতে অভিনয় করেন। কাজেই কোনো প্রযোজক তাঁকে চেকে টাকা দেবেন, এটা স্বাভাবিক।

কর্নেল বুঝতে পেরে মৃদু হেসে বললেন—উজ্জ্বলকুমার ব্ল্যাকমেলার ছিলেন। অমিয় বকসীকে ব্ল্যাকমেইল করতেন। চেক ইস্যু করে পেমেন্ট বন্ধ করতে বলা হয়েছে, তাই সন্দেহ হচ্ছে। আর যা বলছিলুম, শীগগির উজ্জ্বলকুমারের বাড়ি সার্চ কর। ওঁর সংগ্রহে যদি কোনো ফোটো এবং ফোটোর নেগেটিভ যত্ন করে গোপনে রাখা থাকে, সেগুলো খুব দরকার। আমি একটু দেখতে চাই।

অরিজিৎ একটু অবাক হয়েছিলেন। হাত বাড়িয়ে ফোন নিয়ে ডায়াল করলেন। তারপর মৃদুস্বরে কাউকে কিছু বললেন।

ওঁর ফোন করা হলে কর্নেল বললেন—কমিশনার সায়েব ঠিকই বলেছেন অরিজিৎ। মায়াপুরী স্টুডিওর ভেতর কড়া নজর রাখা উচিত। হ্যাঁ, কাজটা সহজ নয়। তবু যতটা পারা যায়। অন্ততঃ গেটে কড়া চেক-আপ না করে ঢুকতে দেওয়া যেন না হয়।

অরিজিৎ হাসলেন।—হিতে বিপরীত হবে না তো কর্নেল! একে তো বাংলা ছবির অবস্থা শোচনীয়। তবু টিমটিম করে যেটুকু চলছে, পুলিসের এরকম কড়াকড়িতে বাধা পাবে না তো ? মায়াপুরী ছেড়ে যদি প্রডিউসাররা অন্য সব স্টুডিওতে ছবি করতে ছোটেন, মায়াপুরী কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টে পুলিসের বিরুদ্ধে ইনজাংশান আনতে যাবেন।

কর্নেল সমস্যাটা ঠাহর করে বললেন—হ্যাঁ।' তবে যে কাণ্ড হল—

রপর দুটো খুন, এর পর এমনিতেই সিনেমার লোকেরা মায়াপুরী সম্পর্কে কট্ ঘাবড়ে যেতে পারে। আতঙ্ক জিনিসটা সংক্রামক। কাজেই মায়াপুরী তৃপক্ষের নিজেদের স্বার্থেই উচিত হবে পুলিসের সঙ্গে সহযোগিতা করা। নী ধরা পড়লে ওঁরা যেমন আর্থিক লোকসান থেকে বাঁচবেন, তেমনি ডিউসাররাও।

অরিজিৎ সায় দিয়ে বললেন—ঠিক, ঠিক। আমরা ওঁদের সঙ্গে এখনই থা বলে সেট্‌ল্ করে নেব।

ষষ্ঠী এতক্ষণে কফি দিয়ে গেল। কফি খেতে খেতে কর্নেল বললেন—বিকেলে তোমাকে ফোনে সীমন্তবাবুর স্টুডিও থেকে ছবি চুরি যাওয়ার ছিলুম। তা ছাড়া অমিয়বাবুকে কে শাসাতে এসেছিল—

বললেন—হ্যাঁ। মায়াপুরী ক্যান্টিনের সুরেশ নামে বয়টির গেছে, ওইদিন সকালে যখন সে প্রতিভা পিকচার্সের অফিসে নতে যাচ্ছিল, সিঁড়িতে একটা লোকের সঙ্গে তার ধা ব রেগেমেগে বেরিয়ে যাচ্ছিল সে। ক্যান্টি তার চেহারা নাকি। একই বয়স। সুরেশ ব তার মনে আছে। কারণ ধাক্কা খেয়ে তারও খুব রাগ হয়েছিল। রার জন্য সে ঘুরে তাকিয়েছিল তার দিকে। কিন্তু সুযোগ পায়নি। রে গেট পেরিয়ে চলে যায় লোকটা।

কর্নেল বললেন—এখন কথা হচ্ছে, সীমন্তের স্টুডিও থেকে ছবিটা চুরি গেছে অমিয়বাবুর ডেডবডি পাওয়ার তিন দিন পরে। সেই যুবকটিই যে বি চুরি করেছে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। ছবিটির সূত্রে তাকে পুলিস জে বের করতে পারে ভেবেই সে মরিয়া হয়ে একাজ করেছে। কিন্তু মধ্যে তগুলো দিন ছবিটার কথা তার মনে পড়েনি কেন?

—হয়তো তলিয়ে এতটা ভাবেনি। অমিয়কে খুন করার তিন দিন পরে চার খেয়াল হয়েছে কথাটা।

—তোমার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু ছবিটা সীমন্তের কাছে আছে বং সীমন্ত সেটা স্টুডিওতে নিয়ে গিয়ে এনলার্জ করেছে, সে জানল কি রে?

অরিজিৎ নড়ে বসলেন।—হ্যাঁ, এ একটা ভাইটাল প্রশ্ন।

কর্নেল কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে চুরুট ধরালেন। বললেন—সীমন্তের

সঙ্গে আবার কথা বলা দরকার। অরিজিৎ, তুমি গিয়ে দেখ উজ্জ্বলকুমারের বাড়ি থেকে কি বেরুল। তুমি আমাকে সেগুলো দেখাতে ভুল না। আর ব্যাংকের ব্যাপারটাও।

অরিজিৎ ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল সীমন্তকে ফোন করলেন গড়িয়াহাটের স্টুডিওতে। সীমন্ত সাড়া দিয়ে বলল—আবার মার্ডার, কর্নেল! মায়াপুরীতে উজ্জ্বলকুমারের ডেডবডি—

—জানি। তুমি এখুনি একবার আমার কাছে চলে এস।

কর্নেল রাজস্থানের মরু প্রজাপতি দম্পতির দিকে তাকিয়ে আছেন। প্রজাপতি দুটোর ডানার রঙ একটু বদলেছে যেন। নাকি চোখের ভুল? আতস কাচটা মাঝে মাঝে তুলে ওদের দেখছেন। প্রকৃতির রহস্যের কোনো অন্ত নেই। হুঁ, কাল ওই হলুদ ফোঁটাগুলো দেখতে পাননি। পেটের …মন লালচে ছিল না। আশ্চর্য! ওদের আবার কি রূপান্তর… পুরুষ প্রজাপতিটা মেয়ে প্রজাপতিটার দিকে সরে গেল… ডানা কয়েক সেকেণ্ড মিশে গেল। তারপর কর্নেল অবাক …ন, দুজনেরই ডানার রঙ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। …ষের ব্যাপারেও যেন তাই। প্রেমিক-প্রেমিকা ঘনিষ্ঠ হবার পর কি … উজ্জ্বলতা ফুটে ওঠে না? এর মধ্যে স্বর্গীয় সুষমা আছে, অস্বীকার করা যায় না। অথচ মানুষের বেলায় প্রকৃতির আরেকটা নিয়ম ক্রিয়াশীল ওই সুষমা কালো হয়ে যায় কখনও পাপের ছোপ লেগে। প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করতে দ্বিধা করে না। তাহলে কি মানুষের প্রেম ব্যাপারটাই অভিশপ্ত? যতক্ষণ মিলিত না হচ্ছে, ততক্ষণ প্রেমিক ও প্রেমিকা প্রেমের উজ্জ্বলতায় সুন্দর। মিলিত হলেই যেন অভিশাপের বিস্ফোরণ। অমিয় বকসী আর মৃদুলা। অমিয় বকসী আর পারমিতা। মৃদুলা স্লিপিং পিল খেয়ে নিজেকে শেষ করে দিয়েছিলেন। অবশ্য কোনো-কোনো প্রেমিক পুরুষ যেন হাঙ্গরের মতো। বিরাট তাদের গ্রাস। সর্বগ্রাসী স্বভাবে হাঁ করে ঘুরে বেড়ায়। অমিয় বকসী—

কর্নেল বুঝ…
অমিয় বকসীকে ব্ল্যা…
বলা হয়েছে, তাই…
বাড়ি সার্চ কর…
যত্ন করে গে…
চাই।

সীমন্ত এসে গেল ব্যস্ত ভাবে।—বাচ্চুদার ফোনে খবরটা পেলুম। আমি আর মায়াপুরীর ত্রিসীমানায় যাচ্ছি না—ওঃ! হরিবল্‌!

কর্নেল ডাকলেন—সীমন্ত!

—বলুন। সীমন্ত নার্ভাস ভঙ্গিতে ঘাম মুছতে থাকল।

—তোমার স্টুডিও থেকে ছবিটা চুরি গেছে গতকাল। ভাল করে স্মরণ করে বল, গত কয়েক দিনে – ধর, অমিয়বাবুর মৃত্যুর পরদিন থেকেই—তোমার স্টুডিওতে কোন রুক্ষ চেহারার ইয়ং ম্যান ছবি তুলতে গিয়েছিল কি না।

সীমন্ত একটু ভেবে নিয়ে বলল—আমি থাকি বাড়িটার ওপরতলায়। স্টুডিও নিচে। সকাল দশটার আগে খুলি। দুজন লোক আছে আমার। দুজনই ছবি-টবি তোলে। ডেভালাপ ও প্রিন্ট সবই করে। খদ্দেরদের তারাই দেখে। আমি তো তালা খুলে দিয়েই বেরিয়ে যাই মায়াপুরীতে। ফিরি রাত সাতটা-আটটা নাগাদ। কোনোদিন আগেও ফিরি—কোনোদিন একটু বেশী রাত হয়। রাত হলে ওরা বউদিকে ডেকে দরজা আটকাতে বলে। কাজেই আমার পক্ষে তেমন কেউ এসেছিল কি না বলা মুশকিল।

—হুঁ, তুমি সেই মেয়েটির ছবি নিজের হাতে এনলার্জ করেছিলে?

—হ্যাঁ। এগুলো আমার নিজস্ব ব্যাপার।

—নেগেটিভটাও তো নিয়ে গেছে?

—সব।

—বাড়ির ভেতর দিক থেকে তালা ভেঙেছিল বলছিলে?

—হ্যাঁ। তবে সেটা সোজা। কারণ বাড়ির পেছনে গ্যারেজ আছে। তার ওধারে নিচু পাঁচিল। দারোয়ান থাকে—একেবারে সদর রাস্তার ওপর গেট। কাজেই পাঁচিল ডিঙিয়ে বাড়ির আড়ালে রাত্রিবেলা কেউ এলে কারুর চোখে পড়ার কথা নয়। সামনেই একটা করিডোর আছে। করিডোরের মাথায় সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়ির নিচে দিয়ে আমার স্টুডিওতে ঢোকার দরজা। ভেতর দিক বলে মাত্র একটা তালা আটকাই।

কর্নেল চোখ বুজে অভ্যাসমতো দাড়ি টানতে থাকলেন। চোর ছবির খোঁজ করতে এসেছে নিশ্চয়, কিন্তু নিজের ছবি তোলানোর মতো আহাম্মক সে হবে না। তবে কি সীমন্তেরই পরিচিত কেউ সে?

বললেন—ছবিটার প্রশংসা নিশ্চয় অনেকের কাছে করেছিলে?

সীমন্ত বলল—হ্যাঁ। তা করেছি। মায়াপুরীতে অনেকের কাছে করেছি। তবে ছবি তাদের দেখাইনি।

—তোমার নিশ্চয় সিনেমা জগতের বাইরেও বন্ধুবান্ধব আছে?

—আছে কিছু। তবে তাদের সঙ্গে বিশেষ দেখা-টেখা হয় না। সময়ও পাই না আগের মতো।

—তাদের কারুর কাছে দৈবাৎ ছবিটার কথা বলেছিলে কি?

সীমন্ত জোরে মাথা নাড়ল।—নাঃ! গত এক মাস যাবৎ বাইরের কারুর সঙ্গে দেখা হওয়া বা ওই ছবি নিয়ে গল্প করার মতো সময়ই পাইনি।

—কিন্তু মায়াপুরীতে অনেকের কাছে ছবিটার কথা বলেছিলে?

—হ্যাঁ। সে তো বললুম। সবাই দেখতেও চেয়েছিল। আসলে আমার ইচ্ছে ছিল ছবিটা নেক্সট অল ইণ্ডিয়া ফোটো একজিবিশনে দেব অন্য সব ছবির সঙ্গে।

ব্যাপারটা তাহলে খুব জটিল হয়ে গেল। কর্নেল টাকে হাত বুলিয়ে একটা বড়ো শ্বাস ছাড়লেন। মায়াপুরী স্টুডিওর লোক হলে যুবকটিকে সুরেশ চিনত। কাজেই বাইরের লোক। বাইরের লোক প্রতিদিন মায়াপুরীর ভেতর অসংখ্য আসে। সীমন্ত যখন ছবিটার কথা বলছিল, তখন কি তার কানে গেছে দৈবাৎ? কাছাকাছি উপস্থিত ছিল কি তখন?

এটা বড্ড বেশী আকস্মিকতা হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য ছবিটার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে তার মায়াপুরীতেই ছুটে আসার সম্ভাবনা। প্রতিভা পিকচার্সের লোকজনেরা আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতেও পারে—যদি ছবিটার কিনারা করতে পারে। ছবিটার সঙ্গে তার জীবনমরণ সমস্যা জড়িয়ে থাকার কথা। ছবিটার সূত্রে পুলিস তাকে খুঁজে বের করতে পারত। কারণ ছবির মেয়েটির হয়েই সে শাসাতে এসেছিল অমিয় বকসীকে।

কর্নেল চোখ খুললেন।—আচ্ছা সীমন্ত, ছবির মেয়েটির—আই মিন, ছবিটার মধ্যে তুমি এমন কি দেখেছিলে যে তোমার অত ভাল লেগেছিল এবং একজিবিশনে দেবার কথা ভেবেছিলে?

—আপনাকে তো আগেই বলেছি কর্নেল, কাব্য করে বলা যায়—বিষাদপ্রতিমা। সীমন্ত একটু হাসল।—তা ছাড়া সরলতা। একটা আলাদা এসথেটিক ডাইমেনসন।

—উঁহু, আর কোনো বৈশিষ্ট্য? একটু ভেবে বল!

সীমন্ত সোজা হয়ে বসল।—কেন? মেয়েটি স্যুইসাইড করেছে বলেই তো আমার কাছে—

—হোয়াট?

কর্নেলের বাজ ডাকার মতো হাঁকরানিতে সামন্ত ঘাবড়ে গেল। ·
া। অমিয়দা বললেন, মেয়েটি সুইসাইড করেছে। তাই শুনেই তো
ামার ইন্টারেস্ট বেড়ে গেল।

—কথাটা কাল তুমি বলনি! কর্নেল কণ্ঠস্বর নরম করে
ললেন।

—ভুলে গিয়েছিলুম।

কর্নেল ফোন তুলে ডায়াল করতে থাকলেন।—হ্যালো! ডি সি
ড ডিকে চাইছি। আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি।··ফেরেনি
খনও? ঠিক আছে। ফিরলেই প্লিজ আমাকে রিং করতে বলবেন।
ামার নাম্বার অরিজিৎ জানে।···ওকে! থ্যাংক ইউ ম্যাডাম!

সামন্ত মুখ চুন করে বসেছিল। কর্নেল সস্নেহে তার পিঠে হাত
খলেন।—ডার্লিং! টেক ইট ইজি। এ একটা মূল্যবান পয়েন্ট আশা
রছি, সুইসাইড কেস যখন, পুলিস রেকর্ডে তার ডেড-বডির ছবি থাকতেও
ারে। বাঁধাধরা নিয়ম কিছু নেই। তবে বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে বা সন্দেহজনক
কসে ফোটো রাখা হয়। দেখা যাক।

সামন্ত আস্তে বলল—দেখলে আমি চিনতে পারবই।

—হুঁ, তুমি ছাড়া আর কে সনাক্ত করবে? বস, একটু কফি খাও
তক্ষণ আমি একটা ছোট্ট কাজ সেরে নিই। প্রজাপতি ডাটোকে কিছুক্ষণ
ান্দুরে রাখা দরকার।··

অরিজিৎ এলেন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়। বললেন—আজ দিনটা যা গেল
ার নয়! আপনি ফোন করেছিলেন শুনলুম। কিন্তু ফোনে অত কথ
া যেত না। তাই আর রিং করিনি।

কর্নেল ইজিচেয়ারে বসে দুলতে দুলতে বললেন—হুঁ, বল ডার্লিং!

—উজ্জ্বলবাবুর বাড়ি সার্চ করে আলমারির লকারে একটা খাম পাওয়া
ছে। দেখাচ্ছি। খামের ভেতর একটা নেগেটিভ এবং তার নতুন দুটে
্রিন্ট আছে।

—অমিয় বক্সী আর মণিদীপা নামে অভিনেত্রীর ছবি। অশালী
নষ্ঠতার নমুনা।

অরিজিৎ অবাক হলেন।—আপনি কি করে জানলেন?

—জানব বলেই তো তোমরা আমার সাহায্য চেয়েছ, ডার্লিং! কর্নেল হো হো করে হাসলেন।

অরিজিৎ হাসতে হাসতে অ্যাটাচি খুলে একটা খাম বের করে দিলেন। খামের ভেতর থেকে সেই নেগেটিভ আর দুটো প্রিন্ট বেরুল পোস্টকার্ড সাইজের। কর্নেল প্রিন্ট দুটো দেখে নেগেটিভটা টেবিল ল্যাম্পের সামনে ধরে মিলিয়ে নিলেন। ছবিটা সত্যি অশালীন অবস্থার। মণিদীপার হয়তো তত দোষ ছিল না। ফিল্মের জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাকে বাধ্য করেছিল আত্মসমর্পণে। কিন্তু অমিয় বকসী কামনাতাড়িত হয়ে এমন পশু হয়ে যেতে পারেন, ভাবলে অবাক লাগে। স্থানকাল জ্ঞান পর্যন্ত ছিল না ভদ্রলোকের।

আরও কয়েকটা ছবি—সবই নানা সাইজের প্রিন্ট। বিভিন্ন পোজে তোলা এক মহিলার তিনটে ছবি। দুটো ছবিতে উজ্জ্বলকুমারের পাশে ঘনিষ্ঠভাবে তিনিই দাঁড়িয়ে আছেন। তত কিছু সুন্দরী নন। কিন্তু সেক্সি চেহারা। মডেল গার্লদের মতো দেখাচ্ছে। কর্নেল বললেন—এ মহিলা কে?

—উজ্জ্বলবাবুর স্ত্রীকে দেখিয়েছি এ ছবি দুটো। উনি বললেন, চিনি না।

—ওঁদের বাড়ির, মানে আর্থিক অবস্থা কেমন দেখলে?

—ভীষণ খারাপ। ভাড়া বাড়িতে থাকেন। হাতিবাগান এলাকায় একটা ঘিঞ্জি গলির ভেতর বাড়িটা। উজ্জ্বলবাবুর স্ত্রীও রুগ্ন মানুষ। দুটি ছেলে একটি মেয়ে। বড় ছেলে স্বপন নাকি একসময় ভাল ফুটবল প্লেয়ার ছিল। হঠাৎ খেলা ছেড়ে দেয়। এখন দাগী আসামী। গোটাকতক কেস ঝুলছে ওর নামে। অ্যাবসকণ্ড করে বেড়াচ্ছে। ছোট ছেলে তপন কারখানায় চাকরি করে। তার নামে থানায় কোনো রেকর্ড নেই। তার আয়েই সংসার চলে। মেয়ের নাম রাখী। রাখী······অরিজিৎ একটু হাসলেন।

—কি?

—থানার রেকর্ডে দেখলুম রাখী কলগার্ল। কয়েকবার ওকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। থ্রেটনিং দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ওর বাবার অনুরোধে।

কর্নেল উজ্জ্বলকুমার এবং অপরিচিতা মহিলার ছবিটা দেখতে দেখতে বললেন—উজ্জ্বলবাবুর স্ত্রী কিছু বলতে পারলেন না?

—না। বললেন, অনেক মেয়েই তো ওঁর সঙ্গে ছবি তুলত একসময়। তুলতে পেলে ধন্য হত।

—তাই বললেন বুঝি?

—হ্যাঁ।

—এই একটা ছবি আমি রাখছি। তুমি এক কাজ কর। বাকি ছবির সাহায্যে মহিলাটিকে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা কর।

অরিজিৎ একটু দ্বিধা দেখিয়ে বললেন—কাজে লাগবে মনে করছেন?

—লাগতেও পারে। হুঁ,—এমন যত্ন করে লুকিয়ে রেখেছিলেন ভদ্রলোক। তাই মনে হচ্ছে, এই সূত্রটারও গুরুত্ব আছে।

অরিজিৎ খামটা ঢুকিয়ে রেখে একটা নোট-বই বের করলেন। বললেন—আর ফেডারেল ব্যাংকেও তদন্ত করা হয়েছে।

কর্নেল ঘুরে বললেন—হুঁ, বল!

—চেকটা ইস্যু করেছেন মণিদীপা সরকার। এখন বোম্বেতে হিন্দী ছবির অভিনেত্রী।

—মাই গুডনেস! উজ্জ্বলবাবু মণিদীপাকেও ব্ল্যাকমেইল করতেন তাহলে?

—মণিদীপা সম্প্রতি কলকাতা এসেছিলেন একটা ছবির শুটিং-এ। শুটিং হয়েছিল অন্য একটা স্টুডিওতে।

—মণিদীপার সঙ্গে শীগগির যোগাযোগ কর। এই চেকটার ব্যাপারে এক্সপ্ল্যানেশান চাও।

—অলরেডি বলে এসেছি যোগাযোগ করতে।

—বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছ, ডার্লিং!

কর্নেল ইজিচেয়ারে আবার দুলতে শুরু করলেন। চোখ দুটো বন্ধ। ষষ্ঠী যথারীতি কফির ট্রে রেখে অরিজিতের দিকে আড়চোখে চাইতে চাইতে ভেতরে গেল। অরিজিৎ বললেন—ষষ্ঠীর কফি খাওয়ার পর অন্য কোথাও কফি রোচে না!

কর্নেল চোখ খুলে চমক খেয়ে বললেন—কি করেছে ষষ্ঠী? প্রজাপতি দুটো—

অরিজিৎ হাসলেন।—না, না। ওর কফির প্রশংসা করছি।

কর্নেল সন্দিগ্ধ মুখে উঠে দাঁড়ালেন—। উঁহু, একবার দেখে আসি। কিছু বলা যায় না। বলে হন্তদন্ত হয়ে ল্যাবরেটরি ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। মিনিট দু'তিন পরে বেরিয়ে এলেন হাসিমুখে।

ইজিচেয়ারে বসে কফির পেয়ালা তুলে বললেন—জুনের শেষাশেষি ছাদে ওদের একটি ব্রিডিং গ্রাউণ্ড তৈরি করা দরকার। কি ভাবে সেটা করা যাবে, সেই সমস্যা। বড় কাকের উপদ্রব।

অরিজিৎ বললেন—হ্যাঁ, আমাদের আর্টিস্ট ভদ্রলোককে বলেছি, সেই যুবকটির মোটামুটি একটা স্কেচ করে দিতে। ওঁকে মায়াপুরী স্টুডিওতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ক্যান্টিন-বয় সুরেশের কাছে চেহারার বর্ণনা নিয়েছেন। তা ছাড়া সুরেশ বলেছিল খোকা নামে আরেকজন ক্যান্টিন-বয়ের সঙ্গে তার চেহারার মিল আছে। খোকাকেও দেখে এসেছেন মোহনবাবু—আর্টিস্ট। জানেন তো কর্নেল? গতবার মোহনবাবুর আঁকা ছবির সঙ্গে ব্যাংক ডাকাত রবি ছেত্রীর চেহারা আশ্চর্যভাবে মিলে গিয়েছিল। জাস্ট বর্ণনা শুনে এঁকেছিলেন মোহনবাবু! খুব টেলেন্টেড লোক।

—ছবিটা আঁকা হলে তদন্তের সুবিধে হবে তোমাদের। সব থানার রেকর্ডে রাখা ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারবে। যেভাবে হোক, ওকে খুঁজে বের করা দরকার।

অরিজিৎ একটু চুপ করে থেকে বললেন—আপনি কি ওকেই খুনী বলে মনে করছেন?

—অমিয় বকসীকে খুন করার জন্য এখন একমাত্র ওর মোটিভটাই জোরালো দেখছি। কারণ প্রথম কথা, সে অমিয়বাবুকে শাসাতে এসেছিল। দ্বিতীয় কথা, আরও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এটা, ছবি চুরি। ছবিটা সে অমিয়বাবুর কাছে ফেরত নিতে আসে নি। কিন্তু যেই অমিয়বাবু খুন হলেন, ব্যাপারটা তার কাছে অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠল। সে যদি দোষী না হয়, তাহলে এই সতর্কতা কেন?

—ঠিক ঠিক। অরিজিৎ সিগারেট ধরালেন।—কিন্তু উজ্জ্বলকুমারকে খুনের মোটিভ এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ব্ল্যাকমেলারের মুখ চিরতরে বন্ধ করা। মণিদীপা ফেঁসে যাচ্ছেন যুক্তিসঙ্গতঃভাবেই।

—অরিজিৎ! দুটো খুনেরই মডুস অপারেণ্ডি—হত্যাপদ্ধতি কিন্তু হুবহু এক! একইভাবে রাতে স্টুডিওর বাগানে মাথার পেছনে হাতুড়ি বা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে আঘাত। আমার ধারণা, উজ্জ্বলকুমারের বডিটাও উইলফ্রেড কোম্পানির ক্যান্টিনের চিমনিতে ঢোকানোর ইচ্ছে খুনীর ছিল। যে কোনো কারণে হোক, পারে নি। বডিটা ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

অরিজিৎ শুনছিলেন কান খাড়া করে। কর্নেল থামতেই বললেন—দ্যাটস রাইট! স্টুডিও এরিয়ার ভাঙা পাঁচিলের অংশটাতে উইলফ্রেড

কোম্পানি শক্ত করে কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছেন। অমিয়বাবুর ডেডবডি পাওয়ার পর পুলিস ডিপার্ট থেকে কোম্পানিকে বলা হয়েছিল বেড়া দিতে। স্টুডিও কর্তৃপক্ষকেও বলা হয়েছে শীগ্‌গির ভাঙা অংশটা মেরামত করতে। এঁদের তো সবতাতেই গড়িমসি। একটা ডিসিসান নিতে দশ মাস লেগে যায়। এক সময় মায়াপুরীর অবস্থা কি ছিল, এখন কি হয়েছে ভাবা যায় না।

কর্নেল হাসলেন।—বাংলা ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির দুর্দশার প্রতিফলন ঘটা স্বাভাবিক, ডার্লিং!

—যা বলেছেন! বলে অরিজিৎ লাহিড়ী উঠে দাঁড়ালেন।—আসি, কর্নেল! রাত্তিরে তো ঘুম-টুম চলে গেছে। তার ওপর আজ সারাটা দিন যা গেল!

—এক মিনিট, অরিজিৎ! এই কয়েকটা পয়েন্ট নোট করে নাও তোমার ডাইরিতে।

অরিজিৎ অ্যাটাচি খুলে নোটবই বের করলেন।—বলুন!

কর্নেল চোখ বুজে দুলতে দুলতে বললেন—লেখো: (১) অজ্ঞাতপরিচয় যুবক এবং ছবির মেয়েটির সম্পর্কে তথ্য চাই। (২) উজ্জ্বলবাবুর পাশে দাঁড়ানো মহিলার পরিচয় চাই। (৩) উজ্জ্বলবাবুর বড় ছেলে স্বপনের একটি ছবি চাই। (৪) তার বোন রাখীর একটি ছবি চাই। (৫) মণিদীপার ওই চেক সংক্রান্ত একটি বিবৃতি চাই এবং সেই সঙ্গে তাঁর জীবন সম্পর্কে তথ্য—অতীত ও বর্তমান সব তথ্যই চাই। লিখেছ?

—হ্যাঁ! আর কিছু?

—লেখো: (৬) ইলেভেন টাইগার্স ফুটবল ক্লাবের কোচ অমর্ত্য রায়ের একটি বিবৃতি চাই।

অরিজিৎ তাকালেন।—অমর্ত্য রায়? কেন বলুন তো?

—তিনি মণিদীপার প্রেমিক ছিলেন এবং অমিয়র ঘোর শত্রু।

—ও! আচ্ছা! তবে ভদ্রলোক বড় টাফ। এ হার্ড-নাট টু ক্র্যাক!

—জানি। এই খুনোখুনি সম্পর্কে ওঁর কি বক্তব্য জানা খুবই দরকার। এই পয়েন্ট থেকে ওঁর বিবৃতি নেবে এবং অ্যালিবাই কি, তাও বিশদ জেনে নেবে। অর্থাৎ অমিয়বাবুর খুনের রাতে কোথায় ছিলেন উনি এবং উজ্জ্বলবাবুর খুনের রাতেই বা কোথায় ছিলেন, কি করেছেন। কথাগুলো সত্য না মিথ্যা, তদন্ত করে দেখার পর আমাকে জানাবে।

অরিজিৎ একটু ইতস্ততঃ করে বললেন—বরং আমার সঙ্গে আপনি চলুন না একদিন। ওঁকে ময়দানে ক্লাবের টেন্টেই পাওয়া যাবে সকালের দিকে। আটটার মধ্যে যেতে হবে। আপনার চোখ দিয়ে ওঁকে যাচাই করার মূল্য অনেক বেশী!

কর্নেল হাসলেন—ঠিক আছে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আমাকে জানিয়ে দিও।

অরিজিৎ ঝটপট নোট-বই অ্যাটাসিতে ঢুকিয়ে বললেন—আসি কর্নেল। তারপর দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেল হাসছিলেন। আরও পয়েন্ট নোট করার ভয়ে বেচারা কেটে পড়ল। স্বাভাবিক সেটা। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল খুব ছোটাছুটি করে বেড়িয়েছে। ওপরতলার তাগিদে তার মতো অফিসারকেও গা ঘামাতে হচ্ছে। না হলে চেয়ারে বসে হুকুম চালিয়ে ক্ষান্ত থাকত। ওর দোষ নেই। আজকাল এরকমটি হয়েছে। প্রশাসন যন্ত্রের জগদ্দল নড়তে চায় না সহজে। ভাগ্যিস অমিয় বকসীর প্রযোজক ছিলেন রথীন্দ্র কুশারী—কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যাঁর আত্মীয় এবং স্বয়ং কমিশনার সায়েব সুহৃদ!

সমস্তটা এখনও জটিল। জটিলতর হয়ে উঠছে। রহস্যের প্রগাঢ় অন্ধকারে এক পা এক পা করে সাবধানে এগুতে হচ্ছে। শুধু একটা ক্ষীণ—অতি ক্ষীণ সূত্র বহু দূরের আলোর বিন্দুর মতো আভাস দিচ্ছে যেন। হুঁ—ওভেনের চিমনি! নরকের আগুনে পাপীর শাস্তি।

আবার চোখ বুজলেন কর্নেল। আলোর বিন্দুটা একটু ঝিকমিক করল যেন। সিনেমার একজন পরিচালক, তারপর একজন অভিনেতাকে নরকে ঢোকানোর ইচ্ছা খুনীর। কে এই খুনী? কোনো নীতিবাগীশ উন্মাদ—ম্যানিয়াক নয় তো, যে মনে করে সিনেমা মানুষের নৈতিক পতন ঘটাচ্ছে?

তাহলে বেছে-বেছে প্রথমে অমিয় বকসী, তারপর উজ্জ্বলকুমারকে কেন? এঁরা দুজনে ব্যক্তিগতভাবে কতটুকু দায়ী এই ব্যাপক সামাজিক অধঃ-পতনের জন্য?

কর্নেল মনে মনে একটু চমকে উঠলেন। ব্য-ক্তি-গ-ত-ভা-বে! হুঁ' খুনী ওঁদের ব্যক্তিগতভাবেই দায়ী করেছে যেন। চোখ খুলেই দেখলেন লোডশেডিং। ঘরে অন্ধকার। ষষ্ঠীকে আলোর জন্য ডাকতে গিয়ে থেমে

গেলেন। যতক্ষণ না সে নিজে থেকে আলো আনে, ততক্ষণ অন্ধকারেই তাঁর চিন্তাশক্তি বেশী সক্রিয় থাকবে।…

সকাল দশটা নাগাদ রথীন্দ্র কুশারী এলেন। সঙ্গে একটি যুবতী। ছিপ-ছিপে চেহারায় মাদকতা আছে। স্লিভলেস ব্লাউস, মেরুন রঙের সিন্থেটিক ফাইবারের শাড়ি পরনে। প্লাক করা ভুরু একটু উঁচুতে আঁকা। ঠোঁটে গাঢ় রঙ শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ্ করা এবং সেই রঙের টিপ। নাকের বাঁ দিকে সরু রিং। চুলেও ফ্যাসান ছমছম করছে। কর্নেল তাকে দেখে নিয়ে বললেন—হুঁ, বসুন মিঃ কুশারী।

রথীন্দ্র বললেন—উজ্জ্বলের মেয়ে রাখী। হঠাৎ আমার কাছে হাজির। কি সব অদ্ভুত কথাবার্তা বলল, মাথায় ঢুকল না। তাই আপনার কাছে নিয়ে এলুম।

কর্নেল একটু হেসে বললেন—আমি এঁকে খুঁজছিলুম। ভালই হল। বলুন কি আপনার কথা?

রাখী আস্তে বলল—আমাকে তুমি বললে খুশি হব স্যার!

—বেশ, বেশ! বল!

ম্যানিকিওর করা আঙুলের নখ খুঁটতে খুঁটতে রাখী ধরা গলায় বলল—কথা আমার বড়দা স্বপন সম্পর্কে। আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে, বাবাকে সেই মার্ডার করেছে। অমিয়বাবুকেও। ওর শাস্তি হওয়া দরকার।

কর্নেল ভুরু কুঁচকে বললেন—কেন সন্দেহ হচ্ছে তোমার?

রাখী মুখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বলল—বড়দা খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশে মাস্তান হয়ে গিয়েছিল। ওর নামে পুলিসের ওয়ারেন্ট ঝুলছে। মাঝে মাঝে লুকিয়ে বাড়ি আসে। আবার চলে যায়। মার্ডার হবার একদিন আগে—সেদিন ছিল সানডে, বাবা বাড়ি ছিলেন। ড্রিংক করেছিলেন। তখন রাত এগারোটা হবে। বড়দা এল সেই সময়। বাবা ওকে দেখে বললেন—'অমিয়কে মেরেছিস। তোকে আমি ফাঁসিতে ঝোলাব। অমিয় আমাকে অমর্ত্যের ভয়ে টাকা দিত মাসে মাসে। তুই আমার রোজগার বন্ধ করে দিলি!'

বড়দা বলল—'বেশ করেছি। এবার তোমাকেও জানসুদ্ধ মেরে দেব। তুমিই নন্দিতাকে অমিয়র সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়েছিলে—সিনেমায় নামার লোভ দেখিয়ে। অমিয় ওর সর্বনাশ করে ছেড়েছিল। বেচারী শেষ

পর্যন্ত স্যুইসাইড করে মরল। এ কি আমি সহজে ভুলব ভেবেছ? বাবা বললেও খাতির করব না।'

বাবা খুব রেগে গিয়ে বললেন—'থাম, তোকে ধরিয়ে দিচ্ছি। রোজ তুই মায়াপুরী স্টুডিওর ভেতর ঘুরঘুর করে বেড়াস, দূর থেকে দেখতে পাই। পুলিসকে বলব. ওত পেতে থাকবে।'

বড়দা সঙ্গে সঙ্গে ড্যাগার বের করল। তপুদা—আমার মেজদা এসে না ধরলে তখনই ও বাবাকে স্ট্যাব করত। তারপর শাসাতে শাসাতে চলে গেল। বাবা তখন কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'তোরা সাক্ষী রইলি। স্বপু আমাকে খুন করবে বলে গেল।'

—নন্দিতা কে?

—বড়দার সঙ্গে লাভ অ্যাফেয়ার ছিল। আমার এক বন্ধু ছিল সে।

—এক মিনিট। বলে কর্নেল ফোন তুলে ডায়াল করলেন। প্লিজ পুট মি টু ডি সি ডি ডি অরিজিৎ লাহিড়ী। হ্যালো অরিজিৎ! কর্নেল বলছি। শোন—তোমার আর্টিস্ট কি ছবিটা এঁকেছে? উজ্জ্বলবাবুর ছেলে স্বপনের সঙ্গে মিল আছে তো? আরে না না, অন্তর্যামী হব কোন্ দুঃখে? হ্যাঁ—সেই যুবকটির নাম স্বপন। ছবির মেয়েটির নাম নন্দিতা। জাস্ট্ হোল্ড অন! বলে ফোনের মাউথপিসে হাত রেখে কার্নল রাখীর দিকে ঘুরলেন।
—নন্দিতা কি? কোথায় থাকত?

রাখী বলল—নন্দিতা দাশগুপ্ত। আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত। মা ছাড়া কেউ নেই



॥ চার ॥

যে দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা ধরেছিলেন, গুলিয়ে গেছে। অমিয় বকসী আর উজ্জ্বল কুমারের হত্যাকারীকে নীতিবাগীশ—এবং যেন আদর্শবাদীও ভেবেছিলেন। রাখী সব ভুল প্রতিপন্ন করে দিয়েছে। খুনের মোটিভ খুব স্পষ্ট হয়ে গেছে। যাক্‌গে, দায়িত্বটা কাঁধ থেকে গেছে। আবার প্রকৃতিরহস্যে ডুবে থাকা যাবে।

কর্নেল ছাদের 'প্ল্যাণ্ট ওয়ার্লডে' খুরপি চালাচ্ছিলেন। মেক্সিকান অর্কিডটায় কুঁড়ি দেখা দিয়েছে। এ সময় খুব যত্ন দরকার। ফুল ফুটতে মাস খানেক লেগে যাবে। ছবিতে দেখেছেন কি অসাধারণ ফুল! মুক্তোর ঝালরে পান্না গাঁথা জড়োয়া গহনার মতো।

তবু কি এক ব্যর্থতা তাঁকে হঠাৎ হঠাৎ অন্যমনস্ক করছে। কেন এ ভুল হল? বয়সের চাপে মস্তিষ্কের স্নায়ু কি নিঃসাড় হয়ে গেছে এরি মধ্যে? এমন ভুল তো এর আগে কখনও হয় নি।

প্রকাণ্ড চুল্লীর ভেতর আগুনের হলকা। নরকের প্রতীক! কিচেনের দরজা বন্ধ ছিল এবং চুল্লীও তখন নেভানো ছিল। নইলে অমিয় বকসীকে চুল্লীতে ঢোকানোরই ইচ্ছা ছিল যেন খুনীর। অগত্যা চিমনিতে ঢুকিয়েছিল—এতেই ইচ্ছার খানিকটা নিবৃত্তি।

তারপর উজ্জ্বলকুমারকে হয়তো চিমনিতে ঢোকাত। কিন্তু পথে বাধা দেখা দিয়েছে তখন। কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে। অগত্যা লাশটা ফেলে দিয়ে চলে গেছে দুঃখিত মনে।

—হুঁ! এই সিদ্ধান্তের পিছনে জোরালো যুক্তি আছে। ভুল হবার তো কথা নয়।

অথচ দেখা যাচ্ছে হত্যাকারীর অস্পষ্ট আদল থেকে শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠল স্বপন নামে এক সাধারণ ক্রিমিন্যাল। আজকাল পিতৃঘাতী ছেলেদের দেখা পাওয়া কঠিন নয়। প্রায়ই কাগজে তাদেরখবর বেরোয়। সামাজিকঅবক্ষয়, নৈতিক অধঃপতন, মূল্যবোধের ভাঙন—এদিকে আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা যেখানে নেমে এসেছে, সেখানে পিতৃহত্যা সামান্য ঘটনা। বোঝা যায়, নন্দিতা নামে প্রেমিকার জন্য স্বপন প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়েছিল। অমিয় বকসীকে শাসাতে গিয়েছিল। বাবাকে শাসিয়েছিল। রাখী অকপটে বলেছে, স্বপন বলেছিল—'মেরেছি, বেশ করেছি!'···

কর্নেল বড় করে শ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। অবশ্য তথাকথিত সমাজ-বিরোধী বা মাস্তানদের কোনোই নীতিবোধ থাকে না, এমনও নয়। কুখ্যাত ডাকাত গরিবদের সাহায্য করে। নিষ্ঠুর খুনীও নারীর প্রেমিক হতে পারে। দুর্দান্ত ঘাতকও কি সস্নেহে পুত্রের মুখচুম্বন করে না? প্রিয়তমা নারীর মৃত্যুতে কি জঘন্য অপরাধীর চোখ অশ্রুতে ভিজে যায় না? নন্দিতার আত্মহত্যার কারণ জানা গেছে—সে গর্ভবতী ছিল। খুব ভাবপ্রবণ মেয়ে ছিল নাকি--তার মায়ের মতে। স্বপনের প্রতিহিংসাপ্রবণ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু···

তবু কোথায় একটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে। সে কি নিজের ডিডাকশান পদ্ধতির ব্যর্থতার দরুন? সারাজীবন এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে সফল হয়েছেন কর্নেল। এতদিনে ব্যর্থ হলেন। তাই বুঝি মনের ভেতর খচখচ করছে পরাজয়ের জ্বালা। মুশকিল হচ্ছে, স্বপনকে কর্নেল তাঁর তৈরী খুনীর মডেলের সঙ্গে মেলাতে পারছেন না।···

ষষ্ঠী এল দুপদাপ শব্দে সিঁড়ি ভেঙে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—ফোং বাবামশাই! জলদি তলপ। নালবাজারের নাহিড়ী সায়েবের ফোং।

কর্নেল খাপ্পা হয়ে খুরপি তুলে বললেন—নিকুচি করেছে তোর নালবাজারের নাহিড়ী সায়েবের।

ষষ্ঠী ভড়কে পিছিয়ে গেল। মুখ করুণ করে বলল—তাইলে বলে দিচ্ছি, বাবামশাই বললেন ফোং ধরবেন না।

কর্নেল খুরপি রেখে হো হো করে হেসে উঠলেন।—তুই বুঝি ভেবেছিলি খুরপিটা তোর মাথায় বসিয়ে দেব? যেমন করে পিছিয়ে গেলি, আমার নিজেকেই মনে হচ্ছিল আমি যেন সত্যি খুনী!

ষষ্ঠী দাঁত বের করল।—আমাকে কি আপনি মাত্তে পারেন? সে কথা ভগমানও বিশ্বাস করবেন না। যান, আর দেরি করবেন না। জলদি তলপ! নাহিড়ী সায়েব লোকটি বড় ভাল। পুলিস বলে মনেই হয় না।

সে কর্নেলের পেছন পেছন চলল কথা বলতে বলতে।—বলবেন, কেন মনে হয় না? মনে হয় না এইজন্যে—ওনার পোশাক-আশাক আপনার মতন। একদিনও তো দেখলুম না পুলিসের পোশাক পরতে। কোমরে বন্দুক, পিস্তলও ঝুলতে দেখলুম না। বড় সাদাসিদে মানুষ, বাবামশাই!

কর্নেল বললেন—ওরে হাঁদারাম! ও যে গোয়েন্দা। গোয়েন্দা বুঝিস?

—বুঝি বৈকি। অ্যাদ্দিন আপনার কাছে আছি অ্যাতটুকুন বয়েস থেকে; গোয়েন্দা বুঝব না?

—বল তো, গোয়েন্দা কি?

—আজ্ঞে, লুকিয়ে যেনারা চোর ডাকাত ধরেন। বাবামশাই, আপনিও তো—

কর্নেল চোখ কটমট করে তাকাতেই ষষ্ঠী কেটে পড়ল। ফোন তুলে বললেন—কি ডার্লিং, স্বপনকে পাকড়াও করে ফেলেছ বুঝি?

—না কর্নেল! তাকে জোর খোঁজা হচ্ছে। আশাকরি, পেয়ে যাব শীগ্‌গির। আমি রিং করেছি মণিদীপার ব্যাপারে।

—ও নিয়ে আর কি হবে? কেস তো সেটল্‌ড্‌।

—কে জানে! ব্যাপারটা আপনাকে জানাতে চাই। খুব ইন্টারেস্টিং এপিসোড। কেস নতুন দিকে টার্ন নিচ্ছে।

—তার মানে?

—মণিদীপা কনফেস করেছেন। সম্প্রতি কলকাতায় শুটিং করতে এসে উজ্জ্বলকুমারের পাল্লায় পড়েছিলেন। মণিদীপা বিয়ে করতে চলেছেন কোটিপতি ব্যবসায়ী ইন্দ্রজিৎ প্রসাদকে। সব কাগজে সে খবর বেরিয়েছে। এদিকে সঙ্গে মিঃ প্রসাদও ছিলেন। বেগতিক দেখে মণিদীপা উজ্জ্বলবাবুকে হাজার টাকার চেক লিখে দেন। কিন্তু তারপর ভেবে দেখেন, ব্ল্যাকমেলারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবেন না। ক্রমাগত তাকে সন্তুষ্ট করে যেতে হবে। মনে শান্তি থাকবে না। তাই প্রাক্তন প্রেমিক ফুটবল-কোচ অমর্ত্য রায়ের শরণাপন্ন হন। অমর্ত্যবাবু খেয়ালী লোক। মণিদীপার সঙ্গে পুরনো প্রেমের খাতিরে কথা দেন, উজ্জ্বলকুমারের মুখ চিরতরে বন্ধ করে দেবেন। তিনিই চেকের পেমেন্ট বন্ধ রাখার জন্য ব্যাংককে নির্দেশ দিতে বলেন।

—বুঝলুম। কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হচ্ছে? কেসের নতুন দিকে টার্ন তো দেখছি না।

—আর একটু আছে, কর্নেল! ব্যাপারটা আবার একটু জট পাকিয়েছে।

—বল!

—স্বপন একসময় ভাল ফুটবলার ছিল। কিছুদিন ইলেভেন টাইগার্সে খেলেও ছিল। অমর্ত্যবাবু তার মুরুব্বি ছিলেন। তারপর—

—তুমি কি বলতে চাইছ, বুঝেছি। অর্থাৎ স্বপনের অমিয়বাবুকে খুন করার পেছনে অমর্ত্যবাবুরও প্ররোচনা ছিল। এই তো? এতে খুনের মোটিভ দ্বিগুণ জোরালো এবং স্পষ্ট হল। কেসে অমর্ত্যবাবুও জড়িয়ে গেলেন। তাই তো?

—আমার কথা শেষ হয় নি, কর্নেল!

—হুঁ, বল।

—অমর্ত্যবাবু স্বপনকে দল থেকে বের করে দেন কোনো কারণে। এমন কি স্বপনের কোনো ভাল টিমে খেলার চান্স পর্যন্ত নষ্ট করে দেন। বাধ্য হয়ে স্বপন ফুটবল থেকে সরে যায়। অমর্ত্যবাবু খেলার জগতে খুব প্রভাবশালী লোক।

—এই তথ্য কোথায় যোগাড় করলে?

—ইলেভেন টাইগার্স ক্লাবের এক খেলোয়াড়ের কাছ থেকে।

—তাহলে অমর্ত্যবাবুর সঙ্গে স্বপনের শত্রুতা ছিল দেখা যাচ্ছে। কাজেই স্বপনকে তাঁর প্ররোচিত করার প্রশ্ন থাকছে না এবং আমরা আগের জায়গায় ফিরে আসছি আবার।

—আসছি না। আরও একটু আছে। মনে দিয়ে শুনুন।

—আহা, শুনছি তো!

—আপনাকে উত্তেজিত মনে হচ্ছে! প্লিজ, দিস ইজ ভাইটাল।

কর্নেল হাসলেন।—না, না। বল ডার্লিং!

—মায়াপুরী স্টুডিওর একজন টেকনিশিয়ান চিরঞ্জীব গাঙ্গুলি আমাদের গোপনে জানিয়েছেন, উজ্জ্বলবাবু খুন হবার রাতে—তখন প্রায় ন'টা বাজে, অমর্ত্যবাবু এসে উজ্জ্বলকুমারকে ডেকে নিয়ে যান। চিরঞ্জীববাবু ওদিকে ল্যাট্রিনে যাচ্ছিলেন। দুজনকে কথা বলতে বলতে বাগানের দিকে যেতে

দেখেন। অমর্ত্যবাবুকে তিনি চেনেন। কে না চেনে ওঁকে? বাঙালী ফুটবল-পাগল জাত। ওঁর মতো বিখ্যাত লোককে অন্ধকারেও চিনে ফেলবে।

—হুঁ, সত্যি আবার জট পাকাল তাহলে। অমর্ত্যবাবুকে মিট কর। ওঁর কি বক্তব্য জেনে নাও এখনই। তবে নামী এবং প্রভাবশালী লোক। সাবধানে এগোনো দরকার।

—সেটাই তো সমস্যা। খুব টাফ ধরনের মানুষ। হার্ড নাট। কর্নেল, আপনি একবার দেখুন না! আপনি তো জাদুকর—জিনিয়াস! ওঁকে ট্যাকল্ করা আপনার পক্ষে কিছুই না।

—লেগপুল কোরো না ডার্লিং!

—কর্নেল। প্লিজ! একে লেগপুলিং বলে না। আপনার নির্ভেজাল প্রশংসা।

—আচ্ছা, আচ্ছা! দেখি, কি করতে পারি।···

দৃশ্যটা বাইরের লোকের কাছে দৃষ্টিকটু। কিন্তু ইলেভেন টাইগার্স ক্লাবের টেন্টে সকলেরই চোখ সওয়া। অমর্ত্য রায় শুধু দুর্ধর্ষ কোচ নন, ক্লাবের অন্যতম কর্মকর্তাও। অবসরকালে ওঁর হাতে হুইস্কির গ্লাস এবং পাশে সুন্দরী মহিলা না দেখতে পেলে কানাকানি শুরু হয়, বসের মুড ঠিক নেই—আজ কোচিং জমবে না।

কাল টেন্টেই রাত্রিযাপন করেছেন অমর্ত্য। ভোর ছ'টার মধ্যেই খেলোয়াড়রা এসে গেছে যথারীতি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্র্যাকটিশ করছে অন্যদিনের মতো একা বা গ্রুপ-ওয়াইজ। এ ক্লাবে অনেক আধুনিক সরঞ্জাম আছে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের। বাঘ যেমন নিজের এলাকায় একেশ্বর এবং বাইরের বাঘকে পা বাড়াতে দেয় না, অমর্ত্যও তাই। গত মাসে এক বিদেশী কোচকে আনা হয়েছিল পরবর্তী বড় ম্যাচের প্রস্তুতির তাগিদে। অমর্ত্যের সঙ্গ বরদাস্ত করতে না পেরে কেটে পড়েন ভদ্রলোক। তাতে ক্লাবে মনান্তর ঘটে নি। সবাই অমর্ত্যের অনুরাগী। তিনি একাই একশো।

আটটা অব্দি গলদঘর্ম পরিশ্রমের পর খেলোয়াড়দের অনেকে চলে গেছে। কয়েকজন আড্ডা দিচ্ছে ঘেরা মাঠের আনাচে কানাচে। টেন্টের একটু তফাতে ঝাঁকড়া প্রকাণ্ড অমলতাস গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছেন অমর্ত্য। হাতে হুইস্কির গ্লাস এতক্ষণে। পরনের শর্টস, গলায় সরু রুপোর লকেটচেন, মাথায়

ফেল্ট টুপি, পায়ে সাদা মোজা এবং কেড্‌স জুতো। তাঁর বুক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সদ্যপ্রয়াত চিত্রাভিনেতা উজ্জ্বলকুমারের মেয়ে রাখী। সে এখন অমর্ত্যের ভাষায় ইন ফুল ফর্ম। তার মানে, স্বাস্থ্যময়ী। তার কাঁধে বাঁ হাত রেখে অমর্ত্য মাঝে মাঝে তার চুলে চিবুক ঠেকানোর চেষ্টা করছেন। উঁচু মানুষ। শরীর অনেকটা বেঁকে যাচ্ছে। রাখী প্রতিবার খিলখিল করে হেসে উঠছে। বলছে—এই! কাতুকুতু লাগছে!

অমর্ত্য বললেন—তোর চুলেও দেখছি নার্ভ আছে!

রাখী ঘুরে বলল—অমর্ত্যদা, ওই ছেলেটা কে গো?

—অ্যাই, সাবধান! ওর দিকে নজর দিবি নে বলে দিচ্ছি! ও এবার আমাদের রেস হর্স নাম্বার ওয়ান।

—কিসে খেলে ও?

—সেন্টার ফরোয়ার্ডে।

—নাম কি ওর?

অমর্ত্য ওর মাথায় মৃদু চাঁটি মেরে বললেন—শাট আপ! তারপর ছায়ায় রাখা বেতের চেয়ারে বসলেন।

রাখী সানগ্লাস খুলে এদিকে ঘুরল এবং টেন্টের ওদিকে একটু দূরে গেটের কাছে কাউকে দেখে চমকে উঠল।—এই, দেখছ ওই লোকটাকে? সে ফিস-ফিস করে বলল।—দেখ, দেখ। আহা, তাকাও না!

অমর্ত্য ঘুরেই দেখতে পেলেন। চোখে বাইনোকুলার রেখে ভদ্রলোক এদিকে তাঁদেরকেই দেখছেন। পাদ্রীর মতো চেহারা। সাদা গোঁফদাড়ি লোকটি অমর্ত্যের মতোই উঁচু। কিন্তু গায়ে-গতরে আরও চওড়া। মাথায় ছাইরঙা টুপি। কাঁধে একটা ক্যামেরাও ঝুলছে।

রাখী আবার ফিসফিসিয়ে উঠল—বুড়ো এখানে কেন? কি মতলব ওর?

অমর্ত্য ষাঁড়ের মতো কাঁধ উঁচু করে বললেন—হু ইজ হি?

—ডিটেকটিভ!

—হোয়াট?

—হ্যাঁ, ডিটেকটিভ। আমি ভীষণ চিনি। ওর নাম কর্নেল—কর্নেল কি যেন, মনে পড়ছে না।

অমর্ত্য হাতে হুইস্কির গ্লাস নিয়ে এগিয়ে গেলেন গেটের কাছে।—হেই!

হোয়াট ডু ইউ থিংক ইউ আর ডুইং? হোয়াট দা ব্লাডি হেল ইউ আর লুকিং ফর?

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে রেখে অমায়িক হাসলেন।—নাথিং মিস্টার! জাস্ট, বার্ড ওয়াচিং! পাখি দেখছি। ওই অমলতাসের গাছে—বাই দা বাই, আমার যদি ভুল না হয়, আমি নিশ্চয় বিশ্ববিখ্যাত প্রাক্তন ফুটবলার অমর্ত্য রায়ের সঙ্গে কথা বলছি? ওঃ! সে এক অভিজ্ঞতা। অসাধারণ স্মরণীয় ঘটনা আমার জীবনে। আমি সেভেনটি টুয়ের ব্যাংককে এশিয়ান ম্যাচের কথা বলছি। ইণ্ডিয়ান টিমের সেণ্টার ফরোয়ার্ডে খেলেছিলেন আপনি। অমন অপূর্ব খেলা জীবনে দেখি নি। আমার পঁয়ষট্টি বছর বয়স হল। দেশে বিদেশে প্রচুর ফুটবল দেখেছি। কিন্তু—

কর্নেল এক পা এক পা করে টেণ্টের দিকে হাঁটছিলেনও কথা বলতে বলতে। অমর্ত্য পাশ কাটিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে চোয়াল শক্ত করে বললেন—আর ইউ ডিটেকটিভ?

কর্নেল হো হো করে হেসে উঠলেন।—কি অবাক কাণ্ড! কে বলল? রাখী বুঝি?

বলেই রাখীর উদ্দেশে হাত নাড়লেন। রাখী নিষ্পলক চোখে ওকে ছিল - অবশ্য আবার চোখে সানগ্লাস। ঠোঁট কামড়ানো। করতে

অমর্ত্য বললেন—দেখুন মশাই! এটা একটা ফুটবল ক্লাবের এখানে এরিয়া। আপনি ট্রেসপাস করেছেন, মাইণ্ড ছাট! আপনি হলে! যাই বেরিয়ে যান, মুশকিলে পড়বেন। আমাকে

কর্নেল গলা নামিয়ে বললেন—অমর্ত্যবাবু, আপনি ৮ মে রুখিয়ে। মায়াপুরী স্টুডিওর বাগানে রাখীর বাবাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন সিন! কিছুক্ষণ পরে তিনি খুন হন। আপনাদের বাগানের দিকে যেতে দেখেছি এক ভদ্রলোক। তিনিই পুলিসকে সব বলেছেন। কাজেই, বুঝতে পারছে আপনি বিপন্ন।

সকালের রোদে অমর্ত্যের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। এবার মুহূর্তে সাদা হয়ে গেল। পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে রুক্ষ স্বরে বললেন—সো হায়াট? আই কেয়ার এ ফিগ ফর ছাট!

—অমর্ত্যবাবু, মণিদীপা পুলিসের কাছে স্টেটমেণ্ট দিয়েছেন লিখিতভাবে। ব্ল্যাকমেইলের শাস্তি দিতে আপনি উজ্জ্বলবাবুর মুখ চিরতরে বন্ধ করে দেবার

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দু-দুজন ভাইটাল সাক্ষীকে আদালত অগ্রাহ্য করতে পারবে না।

অমর্ত্য হুইস্কির গ্লাস ঘাসের ওপর দমাস করে ছুড়ে ফেলে বললেন—গো টু হেল!

—আপনি নামী বিশ্বখ্যাত ব্যক্তি অমর্ত্যবাবু! আদালতে একথা ফাঁস হবে। পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যেও আপনি খুনী সাব্যস্ত হবেন। আপনার কেরিয়ারের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, চরম শাস্তিও হতে পারে। বিশ্বের সব কাগজে প্রচার হবে। স্ক্যাণ্ডাল রটবে।

অমর্ত্য ঘুষি মারবেন বলে হাত তুলেই নামিয়ে নিলেন। গলার ভেতর থেকে বললেন—ওক্কে! কি বলতে চান আপনি?

কর্নেল মিষ্টি হাসলেন।—আমি কথা বলতে চাই আপনার সঙ্গে।

—সবই যখন প্রুভড, তখন কথা বলে কি লাভ? আমি কথা যা বলার কোর্টেই বলব। ইউ গো!

—অমর্ত্যবাবু, প্লিজ! আমি জানি, আপনি শক্ত মানুষ। আপনি র...ন্দী। কিন্তু ভুলে যাবেন না, আজ যেখানে পৌঁছেছেন এবং আরও উঁচুতে ...নার আশা করছেন, তার জন্য আপনাকে প্রচণ্ড স্ট্রাগল করতে হয়েছে। কাছে ক...সরা কোচদের তালিকায় আপনার নাম উঠতে চলেছে। ঠিক এই ফিস করে ... দিনের স্ট্রাগল এবং স্বপ্নকে জেদের বশে কেন নষ্ট করে দেবেন অমর্ত্য...

এদিকে ...র্ত্যের নাকমুখ দিয়ে সশব্দে গরম নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল।

লোকটি ...চলুন অমর্ত্যবাবু, আমরা কোথাও ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াই।

ছাইরঙ ...অমর্ত্য পা বাড়ালেন অমলতাস গাছটার দিকে। ছায়া লম্বা হয়ে আছে ...খনও। কয়েকটা বেতের হালকা চেয়ার রয়েছে সেখানে। রাখী একটাতে শক্ত হয়ে বসে আছে। সানগ্লাসের চৌহদ্দি জুড়ে ঘামের ফোঁটা। ঘাম নাকে, চিবুকে, কপালে।

অমর্ত্য কর্নেলকে বসতে ইশারা করে রাখীকে বললেন—তুই এখন আয় রাখী। পরে দেখা করিস। তারপর কর্নেলকে বললেন—এনি ড্রিংক?

কর্নেল হাত তুলে বললেন—থ্যাংকস। রাখী, তুমি চলে যেও না। একটু অপেক্ষা কর। তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

রাখী অবশ শরীরে মাথাটা একটু দোলাল।

অমর্ত্য বললেন—ওকে। রাখী, টেন্টে গিয়ে বস্। আর পরিমলকে বল্, আমাকে একটা হুইস্কি দিয়ে যাবে।

কর্নেল চুরুট ধরালেন। তারপর বললেন—৮ মে মায়াপুরীতে –

—অমর্ত্য বাধা দিলেন। –ওয়েট এ মিনিট! ড্রিংকটা আসুক। আমার ড নষ্ট হয়ে গেছে।

কর্নেল হাসলেন। চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখতে থাকলেন। ক্লাবের ার্থিক সঙ্গতি আছে। নিজস্ব মাঠ—একটা স্টেডিয়াম বলাই ভাল, একটা ইমিং পুলও দেখা যাচ্ছে অন্য পাশে। ওখানে একটা গেটের মাথায় লেখা াছে ব্যায়ামাগার। উজ্জ্বল সকালের রোদে ঝলমল করছে ফুলের বাগান। াঠে প্র্যাকটিশ করছে দুজন খেলোয়াড়। আর কোথাও কেউ নেই। পৌনে 'টা বেজে এল প্রায়।

ড্রিংক দিয়ে গেলে চুমুক দিয়ে অমর্ত্য বললেন—মণিদীপাকে আমি বিয়ে রতে পারতুম। করিনি। কেরিয়ারের জন্য নিজেকে বিকিয়ে দিতে তার াধত না। তাই অমিয়র ওপরও শেষ পর্যন্ত আমার রাগ হয়নি। ওর কি াষ? মণিদীপা ওর মুখেও লাথি মেরে চলে গেল বোম্বেতে। আমি ওকে লে গেলুম। সম্প্রতি মণিদীপা টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে ছবি করতে াসেছিল। আমি জানতুমই না সে কলকাতা এসেছে। সন্ধ্যাবেলা এখানে সে আছি, হঠাৎ মণিদীপা এসে হাজির। মহা ধূর্ত মেয়েছেলে! যাই লুন মশাই, মেয়েদের অভিনয় করার ন্যাক জন্মগত। কেঁদেকেটে আমাকে লল, উজ্জ্বল ওকে ব্ল্যাকমেইল করতে গিয়েছিল একটা ছবি দেখিয়ে। বিটা আমাকেও দেখিয়েছিল উজ্জ্বল। অমিয়র সঙ্গে সে এক ডার্টি সিন! মিয়টা ছিল কুকুরেরও অধম।

—আপনি মণিদীপাকে আশ্বাস দিলেন?

—দিলুম। আফটার অল আমার প্রাক্তন প্রেমিকা। ওকে বললুম, কাল ফার্স্ট আওয়ারে ব্যাংককে বলে দাও, পেমেণ্ট যেন না দেয় উজ্জ্বলকে।

—আর বললেন, উজ্জ্বলের মুখ চিরতরে বন্ধ করে দেবেন?

—ওর কান্নাকাটি দেখে একথা না বলে উপায় ছিল না তো!

—আপনি মায়াপুরীতে গেলেন কেন?

—উজ্জ্বলকে বুঝিয়ে সুজিয়ে বা ভয় দেখিয়ে নিবৃত্ত করতে—যাতে সে মণিদীপাকে ব্ল্যাকমেল না করে। তা ছাড়া মণিদীপা একটা অফারও দিয়েছিল।

পাঁচ হাজার টাকা সে দিতে রাজি, যদি উজ্জ্বল নেগেটিভ আর সব প্রিং ছবি ফেরত দেয়। আমি তাই উজ্জ্বলের কাছে এই অফারটা নিয়ে গিয়েছিলুম।

—কিন্তু অত রাতে কেন?

অমর্ত্য রেগে গেল।—উজ্জ্বলকে খুন করার ইচ্ছে থাকলে ওকে এই টেগে ডেকে পাঠিয়ে তা পারতুম! মদের লোভে ও চলে আসত! তা ছাড়া ও আমার বহুকালের বন্ধু।

—ঠিক, ঠিক। বলুন।

—মণিদীপার তর সইছিল না। সেদিন ছিল রবিবার। ওর গাড়িতেই ওকে সঙ্গে নিয়ে উজ্জ্বলের বাড়ি চললুম।

—ও! তাহলে ৭ মে প্রথমে ওঁর বাড়িতেই গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। কিন্তু সেন্ট্রাল এভেন্যুতে কি সব হাঙ্গামায় ট্রাফিক জ্যাম আটকে গেলুম। হঠাৎ আমার মাথায় বদ খেয়াল এসে গেল। জ্যাম ছাড়তে দেরি হবে। ততক্ষণে কাছাকাছি কোনও বারে মণিদীপাকে পাশে নিয়ে ড্রিংক করা যায়। জাস্ট এ নস্টালজিয়ার প্রকোপ বলতে পারেন। মণিদীপা তখন আমার করায়ত্ত। যা বলব, মেনে নিতে প্রস্তুত।

—হুঁ, বারে গেলেন এবং ড্রিঙ্ক করলেন। তারপর?

—টু কাট শর্ট, বেরুলুম যখন তখন রাত সাড়ে দশটা। আমি বেশ খানিকটা মাতাল হয়ে গেছি। উজ্জ্বলের বাড়ি থেকে একটু দূরে গাড়ি রইল। গাড়িতে মণিদীপা আর ড্রাইভার। আমি উজ্জ্বলের বাড়ির দরজায় নক করতে যাচ্ছি, ভেতরে বাস্টার্ড স্বপনটার গলা শুনতে পেলুম। সে তার বাবাকে অকথ্য গালিগালাজ করে শাসাচ্ছে। বাবাটিও কম নয়। সমানে মুখ খিস্তি করছে। বাধ্য হয়ে চলে এলুম। মণিদীপাকে বললুম, ভেবো না। আগামীকালই ওর সঙ্গে যোগাযোগ করব আবার।

—অমর্ত্যবাবু, স্বপনকে আপনি দল থেকে তাড়িয়ে ছিলেন কেন?

—বললুম তো, হি ইজ এ বাস্টার্ড।

—ওর কেরিয়ার নাকি আপনি নষ্ট করে দিয়েছিলেন?

অমর্ত্য রাগী চোখে তাকাল। তারপর গেলাসে চুমুক দিয়ে বলল—হ্যাঁ। দ্যাটস ফ্যাক্ট।

—কিন্তু কেন?

—এর সঙ্গে ওসবের কোনো সম্পর্ক নেই। আপনাকে আমি তা লব না।

—নন্দিতাকে তো আপনি চিনতেন?

অন্ধকারে একটা ঢিল ছোঁড়ার মতো প্রশ্ন। কর্নেল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ইলেন অমর্ত্যের মুখের দিকে। অমর্ত্যের চোখ দুটো সঙ্গে সঙ্গে নিষ্পলক য়ে গেল। অতি সূক্ষ্ম কয়েকটা রেখা জলের ওপর মুহূর্তকালের শিহরণের তো ফুটে মিলিয়ে গেল।

তারপর সটান উঠে দাঁড়ালেন অমর্ত্য—ইউ গো! যত সব বাজে প্রশ্ন!

—প্লিজ অমর্ত্যবাবু! আপনাকে বাঁচাবার স্বার্থেই এটা জানা দরকার। রে আপনাকে সব বলছি। প্রশ্নটার জবাব দিন।

অমর্ত্য বসলেন। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন—কে নন্দিতা? আমি জানি না।

কর্নেল বুঝলেন, অমর্ত্য গোপন করলেন ব্যাপারটা। বললেন—ঠিক আছে। মায়াপুরীতে গেলেন পরদিন। কিন্তু অত রাতে কেন?

—উজ্জ্বলকে ফোন করেছিলুম স্টুডিওতে। জানতুম, সে হ্যাংলার মতো টুডিওতে সকালেই গিয়ে হাজির হয়। রাত অব্দি থাকে। ওর ব্যাপারটা ছিল অচল আইনজীবীদের মক্কেল পাকড়ানোর মতো। কোনো ছবিতে রোল া থাকলেও যেত। ঘুরঘুর করে বেড়াত। নতুন প্রডিউসার বা ডাইরেকটারদের পছন পেছন ঘুরত। তো উজ্জ্বলকে আমি ফোনে বললুম, 'মণিদীপার ব্যাপারে তামার সঙ্গে কথা বলতে চাই!'

উজ্জ্বল মণিদীপার নামে খিস্তি করে বলল, 'বজ্জাত মাগী আমাকে চেক দয়ে পেমেন্ট স্টপ করতে বলেছে। আমি দস্তুরমতো অপমানিত হয়েছি ্যাংকে গিয়ে। কালই ওর হবু বরের কাছে গ্র্যাণ্ড হোটেলে হাজির হচ্ছি।'

বললুম, 'মণিদীপা রফা করতে চায়। তুমি চলে এস আমার ক্লাবে।'

উজ্জ্বল বলল—'তোমার মাথা খারাপ? আজ আমার হেভি শুটিং! রাতে ডনার—উইথ ড্রিংকস! আজ স্টুডিও ছেড়ে বেরুনোর উপায় আছে?'

সমস্যা হল সেদিন আমার ক্লাবে জরুরি মিটিং। বিকেলে মোহনবাগানের ঙ্গে সঙ্গে একটা চ্যারিটি ম্যাচ। এ সব সেরে বেরুতে রাত্রি হয়ে যাবে। তাই ললুম, 'ঠিক আছে। আমি রাত আটটা থেকে ন'টার মধ্যে তোমার কাছে যাচ্ছি।

উজ্জ্বল এদিন খুব মুডে ছিল। বলল, 'বেশ, তাই এস। আমাকে তুমি াড়ি করে পৌঁছে দেবে বাড়িতে। ভালই হবে।'

—তারপর আপনি স্টুডিওতে গেলেন ?

—ড্রিংক নিয়ে বসলে আমার কিছু খেয়াল থাকে না। রাত সাড়ে আটটায় মণিদীপা হোটেল থেকে ক্লাবে ফোন না করলে ভুলেই যেতুম। তখন সাড়ে আটটা বেজে গেছে। তক্ষুণি গাড়ি নিয়ে বেরুলুম। গিয়ে দেখি উজ্জ্বল স্টুডিওর দু নম্বর ফ্লোরের ওপাশে লনে দাঁড়িয়ে মৌজ করে সিগারেট টানছে। খাওয়া এবং ড্রিংক ভালই হয়েছে। বললুম, 'চল, একটু নিরিবিলিতে গিয়ে বসি কোথাও।'

উজ্জ্বল বলল, 'চলো, পুকুরের পাড়ে বেঞ্চে গিয়ে বসব। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। জমবে ভাল।'···

অমর্ত্য একটা শ্বাস ছাড়লেন। তারপর ডাকলেন—পরিমল ! আরেকটা দিয়ে যা।

মাথায় চূড়োবাঁধা চুল, মুখে যথেচ্ছ গোঁফদাড়ি, পরনে খাকি হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি, একটা লোক ড্রিঙ্ক নিয়ে কর্নেলের দিকে আড়চোখে তাকাতে তাকাতে চলে গেল খালি গ্লাসটা নিয়ে।

চুমুক দিয়ে অমর্ত্য বললেন—জ্যোৎস্না ছিল। কিন্তু খোয়ায় ঠোক্কর লেগে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলুম। উজ্জ্বল বকবক করতে করতে আপন খেয়ালে কিছুটা এগিয়ে গেছে। দুধারে ঘন ঝোপঝাড়—একেবারে জঙ্গল। উঠে পোশাক থেকে ধুলো ঝাড়ছি, হঠাৎ উজ্জ্বল একটা অদ্ভুত শব্দ করল। তাকিয়ে দেখি সে টলতে টলতে পড়ে যাচ্ছে। ভাবলুম নেশা বেশি হয়ে গেছে। তারপর সে ধপাস করে পড়ে গেল। কাছে গিয়ে বললুম, 'সহ্য হয় না তো অত খাওয়া কেন বাবা ?' বলে ওকে ওঠাতে গিয়েই চোখে পড়ল ওর সাদা পাঞ্জাবির পিঠের দিকে কালো ছোপ চকচক করছে। হাত দিতেই টের পেলুম রক্ত। চুল থেকে রক্ত গড়িয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলুম কি হয়েছে। প্রচণ্ড ভয় পেলুম—কেউ ওকে মেরে পালিয়ে গেল এবং এর জন্য আমার কাঁধেই সব দোষ পড়বে। বুঝতেই পারছেন, আমার অবস্থাটা তখন কি। তবে সঙ্গে সঙ্গে আমি জেনে গেছি খুনী কে। দ্যাট বাস্টার্ড, স্বপন !

—তারপর আপনি চলে এলেন ? কাউকে কিছু না জানিয়ে ?

অমর্ত্য গ্লাসে চুমুক দিয়ে গরম শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন—হ্যাঁ ! চলে আসব না কেন ? ছেলে বাবাকে খুন করেছে —

—কিন্তু আপনি তো কাউকে দেখতে পাননি ?

—না। মনে হয় স্বপন ফলো করেছিল। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। স্বপনের পক্ষে সব সম্ভব।

—এবার নন্দিতার কথা বলুন!

—আবার সেই কথা? হু ইজ দ্যাট হোর? ডোণ্ট টক অ্যাবাউট হার।

—রাখী আপনার কাছে আসে দেখছি!

—রাখী ইজ অলসো এ হোর! আমাকে পটাতে আসে চাকরির জন্য। আমি ওর বাপের বয়সী।

কর্নেল বুঝলেন নেশা হয়ে গেছে একটুতেই। অবশ্য আবহাওয়াটা কড়া। এখনও ব্রেকফাস্টও হয় নি সম্ভবতঃ। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—ধন্যবাদ। আসি অমর্ত্যবাবু!

অমর্ত্য ঘাড় গোঁজ করে দুহাতে গ্লাসটা চেপে ধরে ভুরু কুঁচকে মাঠের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইলেন।

কর্নেলকে দেখে টেণ্ট থেকে বেরিয়ে এল রাখী। মুখে গাঢ় ছায়া থমথম করছে। কর্নেল বললেন—বাড়ি যাবে না?

দূরে অমর্ত্যের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে রাখী বলল—আপনার গাড়ি আছে সঙ্গে?

—আছে। এস, তোমাকে পৌঁছে দেব।···

লাল ল্যাণ্ডরোভার গাড়িটা সেন্ট্রাল এভেন্যু দিয়ে আস্তে সুস্থে এগোচ্ছিল। এখনই রাস্তায় গাড়ি ও মানুষের ভিড় শুরু হয়েছে। পিক আওয়ার্সের প্রথম মুহূর্ত। ট্রাফিক সিগনালের সামনে থামলে রাখী মৃদুস্বরে বলল—অমর্ত্যদাকে আপনারা অ্যারেস্ট করবেন?

কর্নেল হাসলেন।—তুমি ওঁকে অমর্ত্যদা বল?

—আঃ! বলুন না ওকে অ্যারেস্ট করবেন নাকি?

—না। কেন?

রাখীর ওপর থেকে ছায়াটা সরে গেল। একটু হাসল সে।—তাহলে আমার চাকরিটা পাওয়ার চান্স রইল। বাব্বা! আপনাকে দেখে আমার যা ভয় হয়েছিল!

কর্নেল ওর দিকে সোজা তাকিয়ে বললেন—তোমার বড়দাকে অমর্ত্যবাবু ক্লাব থেকে কেন তাড়িয়েছিলেন জান?

—অমর্ত্যদাটা যা খচ্চর আছে, না! ভাবতে পারবেন না। নেহাত চাকরির জন্য ওর কাছে যাচ্ছি। বড়দা পালিয়ে না বেড়ালে যেতে পারতুম ভাবছেন? স্ট্যাব করে মেরে দিত। বলতে নেই, আমার বাবাটার কোনো সেন্স ছিল না।

—আমার প্রশ্নের জবাব দাও, রাখী!

—একটা মেয়েকে নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছিল। বড়দা অমর্ত্যদাকে খুব পেঁদিয়েছিল, জানেন?

—নন্দিতার জন্য?

রাখী মাথা নাড়ল।—উঁহু, নন্দিতা তো বড়দার সেকেণ্ড গার্ল। সে একটা মেয়ে ছিল চন্দ্রা নামে। চন্দ্রা থাকত ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে। ওকে পিক আপ করেছিল বড়দা। সঙ্গে করে ক্লাবে যেত। আর অমর্ত্যদাটা না এমন পাজি, জানেন? চন্দ্রাকে বাগিয়ে নিল বড়দার কাছ থেকে। চন্দ্রার সঙ্গে আমার ভাব হয়েছিল! সেই তো আমাকে আর নন্দিতাকে—

রাখী থেমে গেল হঠাৎ। নখ খুঁটতে থাকল। কর্নেল আস্তে বললেন —বুঝেছি। খারাপ পথ দেখিয়েছিল।

রাখী দুঃখিত ভাবে হাসল একটু।—বলতে নেই, চন্দ্রা ব্লাডক্যান্সারে মারা গেছে। তবে অনেক দুঃখে ও এমন হয়েছিল।

সিগন্যাল পেয়ে গাড়ি স্টার্ট দিলেন কর্নেল। স্বপন ক্রমশঃ স্পষ্ট হচ্ছে চোখের সামনে। তাঁর তত্ত্বের কাছাকাছি এসে পড়েছে এবার। অথচ তবু একটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে। যাকে ভেবেছেন, তার সঙ্গে কোথায় যেন ফারাক।…



। পাঁচ ॥

আজ স্বপনের ছবি বেরিয়েছে সব কাগজে 'ওয়ান্টেড' শিরোনামে। বাংলায় "সন্ধান চাই'। ছবি অস্পষ্ট বলে বর্ণনাও দেওয়া আছে চেহারার। 'শ্যামবর্ণ, শক্ত পেশীবহুল গড়ন, উচ্চতা ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি, রুক্ষ চেহারা, খাড়া নাক। কপালে কাটা দাগ আছে। ডান বাহুর ওপর একটা জড়ুল আছে। কবজিতে স্টিলের বালা পরার অভ্যাস আছে। বিশেষ করে ফুটবলের দর্শকরা চিনবেন। একসময় ইলেভেন টাইগার্স ক্লাবের ব্যাকে খেলত। স্বপন অধিকারী। বাবার নাম উজ্জ্বলকুমার—প্রখ্যাত অভিনেতা। গ্রেফতারে সাহায্য করলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার। কলকাতা পুলিস হেডকোয়ার্টারে ক্রাইম ব্রাঞ্চে খবর দিন।'

কর্নেল ছাদে একটা অর্কিডের টবের পাশে মোড়ায় বসে কফি খেতে খেতে একগাদা খবরের কাগজ ওল্টাচ্ছিলেন। মুড়ে ফেলে দিলেন একধারে। ষষ্ঠী এসে নিয়ে যাবে। কফির পেয়ালা রেখে উঠে দাঁড়ালেন। সিঁদুর রঙের গোল পাতাওয়ালা অর্কিডটার দিকে তাকিয়ে রইলেন অন্যমনস্কভাবে। নেপালের দুর্গম জঙ্গল থেকে এনেছিলেন অর্কিডটা। হঠাৎ চোখ পড়লে চমকাতে হয়। যেন চাপ চাপ টাটকা রক্ত।

একটু বোকামি করেছে পুলিস। এই ছবি স্বপনকে আরও সতর্ক করে দেবে! মায়াপুরী স্টুডিওর ক্যান্টিন-বয় সুরেশ তাকে চিনতে না পারে—ও বেচারা ফুটবলের দর্শক হওয়ার সুযোগ পায়নি বলেই, কিন্তু অসংখ্য লোক তাকে চেনে। হুঁ, অমিয় বকসী তাকে চিনতে পেরেছিলেন কি না কে জানে! না পারাই সম্ভব। অমিয় ছিলেন অন্য জগতের লোক। তবে উজ্জ্বলকুমারের ছেলে হিসেবে অবশ্য—

নাঃ। তাহলে রথীন্দ্র কুশারীকে তার নামই বলতেন। শুধু একটা গণ্ডগোল থেকে যাচ্ছে, স্বপন স্টুডিওর ভেতর যদি নন্দিতার ছবির খোঁজে যাতায়াত করে থাকে, তাহলে কারুর না কারুর তাকে চেনার কথা। অন্ততঃ প্রাক্তন ফুটবলার হিসেবেই। ছবিটা যে তার পক্ষেই চুরি করার যুক্তি আছে, তাতে সন্দেহ নেই। সে স্টুডিওতে না গেলে ছবির খোঁজ পেত না। সীমন্ত অনেকের সামনে ছবিটার কথা বলেছিল। স্বপন সেই সময় শুনে থাকতে পারে। কিন্তু তাকে কেউ চিনল না, এটা কেমন করে সম্ভব? পুলিস প্রত্যেককে জেরা করেছে। কেউ বলেনি প্রাক্তন ফুটবলার এবং উজ্জ্বলকুমারের ছেলেকে তারা দেখেছে!

হুঁ, রাখীর কথা অনুসারে উজ্জ্বলকুমার নাকি তাকে স্টুডিওতে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিলেন।

রাখীর ওই গল্পটা অমর্ত্যের শেখানো নয় তো? অমর্ত্যই কি তাকে রথীন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছিলেন স্বপনকে অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য? কাল সকালে ক্লাবের টেন্টে অমর্ত্যও বলেছেন, ৭ মে রাত এগারোটায় উজ্জ্বলবাবুর সঙ্গে স্বপনের ঝগড়া হচ্ছিল। রাখীর কথার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। এদিকে রাখী চাকরির জন্য নাকি অমর্ত্যের কাছে ঘোরাঘুরি করছে। তাই অমর্ত্যের কথায় সে রাজী হয়ে ওই ঝগড়ার গল্পটা বানিয়ে বলতেও পারে। অমর্ত্য যে স্বপনকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে, তা বোঝা গেছে তার কথাবার্তায়।

নিঃসন্দেহ হওয়া যাচ্ছে না। নন্দিতার ছবি চুরিটা এখনও রহস্য থেকে যাচ্ছে। স্বপন কি করে ছবিটার খোঁজ পেল?

—গুড মর্নিং, কর্নেল!

কর্নেল ঘুরেই থমকে গেলেন। তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন—হ্যাল্লো ডার্লিং! কি আশ্চর্য যোগাযোগ! ঠিক এই মুহূর্তেই তোমার কথা ভাবছিলুম।

সীমন্ত হাসল।—থ্যাংকস! সোজা ছাদে আসতে ভয় পাচ্ছিলুম। আপনার লোকটা বলল, চলে যান!

কর্নেল হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর তার কাঁধে হাত রেখে বললেন—এই মোড়াটায় বস। কাজ করতে করতে গল্প করি।

সীমন্তের কাঁধ থেকে ক্যামেরা ঝুলছিল। বলল—এক সেকেণ্ড! এখানেই দাঁড়ান। একটা ছবি তুলি।

সে পিছিয়ে গেল। তারপর ক্যামেরা ঠিক করে নিয়ে গোটা তিনেক শট

নিয়ে মোড়ায় গিয়ে বসল।—দারুণ আসবে। বাই দা বাই, যেজন্য এলুম, বলি। আজ কাগজে একটা ছবি বেরিয়েছে দেখেছেন ?

—স্বপন অধিকারীর।

—হ্যাঁ। দেখে তো আমি চমকে গেছি। আমি কল্পনাও করিনি যে স্বপনকে পুলিস খুঁজছে !

—স্বপনকে তুমি চেন বুঝি ?

—চিনব না ? ও ছিল প্রচণ্ড প্রতিশ্রুতিবান ফুটবলার এবং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

কর্নেল উত্তেজনা দমন করে বললেন—স্বপন কি কখনও মায়াপুরীতে গেছে, সীমন্ত ?

সীমন্ত একটু চুপ করে থাকার পর বলল—অমিয়দার মৃত্যুর দুদিন পরে গিয়েছিল আমার কাছে। হ্যাঁ আরও একদিন গিয়েছিল। কিন্তু ওর যাওয়াটা একটু অদ্ভুত লেগেছিল। কারণ গেট দিয়ে ওকে বাগানের দিক থেকে আসতে দেখেছিলুম। যাবার সময়ও গেল ওদিক দিয়ে। এখন বুঝতে পারছি, ও ফেরারী আসামী বলেই লুকিয়ে এসেছিল।

—হুঁ, অমিয় বকসীর কাছে আসার দিন তার অত সতর্কতার দরকার ছিল না। কিন্তু অমিয়বাবুর মৃত্যুর পর সে খুব সতর্ক হয়ে উঠেছিল। কর্নেল ভাবনার মধ্যেই বললেন—তখনও কি ভাঙা অংশটায় বেড়া দেওয়া হয়নি ?

—লক্ষ্য করিনি। তবে পাঁচিল ডিঙিয়ে যাওয়া এমন কিছু শক্ত নয় ওর পক্ষে।

—তোমার কাছে কেন এসেছিল ও ?

সীমন্ত একটু ইতস্ততঃ করে বলল—তখন ব্যাপারটা এত তলিয়ে ভাবিনি। তাই আপনাকে গোপন করেছিলুম। আফটার অল স্বপন আমার বন্ধু। তাকে বিপদে ফেলতে চাইনি।

—দ্যাটস রাইট্। বল !

—স্বপন আমাকে বলল, তার এক বান্ধবী সিনেমায় নামার জন্য একটা ছবি পাঠিয়েছিল অমিয়বাবুর কাছে। অমিয়বাবু তো মারা পড়েছেন। ছবিটা যদি অফিস থেকে খুঁজে বের করে দিই, সে তাকে ফেরত দেবে। স্বপন ছবিটার বর্ণনাও দিল মোটামুটি। শুনেই আমি বুঝলুম কোন্ ছবিটার কথা ও বলছে।

—তুমি কি বললে ?

—তখনও ছবিটার আমি নেগেটিভ তুলিনি। তাই চেপে গিয়ে বললুম, পরশু আসিস। খুঁজে রেখে দেব। ও চলে গেল।

—তারপর আবার এল তো ?

—হ্যাঁ। ছবিটা আমি এনেছিলুম সঙ্গে। ওকে ফেরত দিয়ে বললুম, ছবিটা অসাধারণ রে! এনলার্জ করে কয়েকটা প্রিণ্ট করে রেখেছি। ভাবছি অল ইণ্ডিয়া ফোটো একজিবিশনে দেব। শুনে ও গম্ভীর হয়ে চলে গেল। তুদিন পরে—সেভেন্থ্ মে রাত্রে আমার স্টুডিওর তালা ভেঙে—

—ওয়েট, ওয়েট! তাহলে তুমি জানতে ছবিগুলো কে চুরি করেছিল ?

—জানতুম। কিন্তু স্বপনের স্বার্থে কথাটা বলিনি। আমি আন্দাজ করেছিলুম, ব্যাপারটার পেছনে কোনো গণ্ডগোল আছে। যাই হোক, আমি এজন্য ক্ষমা চাইতে এসেছি, কর্নেল!

—নেভার মাইণ্ড! স্বপনকে পুলিস অমিয়বাবু আর ওর বাবা উজ্জ্বলবাবুকে খুন করার অভিযোগে খুঁজছে।

সীমন্ত চমকে উঠল।—সে কি! স্বপন তার বাবাকে খুন করেছে? অসম্ভব। অমিয়দার ওপর ওই মেয়েটার ব্যাপারে তার রাগ থাকতে পারে। কিন্তু নিজের বাবাকে—এ আমি বিশ্বাস করি না, কর্নেল! আপনি যাই বলুন!

কর্নেল একটা ক্যাকটাসের গোড়ার মাটি আলগা করে দিতে দিতে বললেন—স্বপনের বোন রাখীকে তুমি চেনো ?

—খুব চিনি। শি ইজ এ স্পয়েল্ড চাইল্ড! বারে হোটেলে রেস্তোরাঁয় ঘোরে। বহুবার রাস্তায় অনেকের সঙ্গে ফ্লার্টিং করতেও দেখেছি। কলগার্ল-টাইপ মেয়ে।

—স্বপন কিছু বলত না বোনকে ?

—জানি না। ওর সঙ্গে রাখীর কথা আলোচনা করা যায় না।

—রাখী কখনও কি স্টুডিও পাড়ায় এসেছে ?

—একসময় আসত ওর বাবার সঙ্গে। চান্স পায়নি। ওর ফেস ফোটোজেনিক নয়। ছবিতে বড্ড বাজে আসে! গলার স্বরও কেমন ক্যানকেনে। আমার সঙ্গে মেশার চেষ্টা করত। পাত্তা দিইনি।

কর্নেল একটা অর্কিডের দিকে এগিয়ে গেলেন। ফুট চারেক উঁচু মাচায়

বসানো আছে। পাতাগুলো জিভের গড়নের। সবুজ রঙ। মধ্যে প্রচণ্ড লাল-লাল ছিটে। কিনারায় হলুদ লম্বাটে রেখা।

বরাবর এরকম ঘটেছে প্রতিটি হত্যাকাণ্ডে। যারা যা জানে, তার পুরোটা বলছে না। গোপন করছে নানা স্বার্থের কথা ভেবে। আবার যে জানে, সে জানে যে সে তা জানে না। অনর্গল কথা বলতে বলতে তবে তা বেরিয়ে আসে। সক্রেটিসের উক্তির মতো—আই নো দ্যাট আই ডোণ্ট নো হোয়াট আই নো অ্যাণ্ড আই ডোণ্ট নো দ্যাট আই নো হোয়াট আই ডোণ্ট নো। হেঁয়ালি নয়। মানুষের মনস্তত্ত্বের এই নিয়ম। যাকে জেরা করছি, সে ভাবছে এ কথাটা অপ্রয়োজনীয়, অতএব বলে লাভ নেই—অথচ সেটাই হয়তো আমার কাছে খুব প্রয়োজনীয়।

তবে সীমন্ত বন্ধুত্বের খাতিরেই কিছু সত্য গোপন করেছিল। অবশ্য তাতে অসুবিধে হয়নি। স্বপনই যে ছবি চুরি করেছে, তাতে সন্দেহ ছিল না। শুধু আনুষঙ্গিক কিছু ব্যাপার স্পষ্ট হচ্ছিল না। এবার হল।

সীমন্ত উঠে এল অর্কিডটার কাছে।—আরে! এমন অর্কিড তো প্রচুর দেখেছি একস্থানে।

কর্নেল হাসলেন—আবার একটা মিথ্যা বলছ, ডার্লিং?

ভড়কে গেল সীমন্ত—না, বিশ্বাস করুন, দেখেছি। প্রচুর।

। অর্কিড খুব রেয়ার স্পেসিজ। কোত্থেকে এনেছি জান? প্রশান্ত ...ব টোরা আইল্যাণ্ড থেকে। আর তুমি বলছ প্রচুর দেখেছ।—

...ছ?

...গুহারবার থেকে কাকদ্বীপের পথে জাস্ট দু মাইল দূরে। নদীর ...। বাগানে। ওখানে একটা ছবির লোকেশন দেখতে গিয়েছিলুম।

...র্নেল ঘুরে দাঁড়ালেন—ঠিক এই অর্কিড? ভাল করে দেখে বল!

সীমন্ত জোর দিয়ে বলল—আমি বলছি আপনাকে! চলুন, বালকদার বাড়িতে আপনাকে দেখাব। বালকদারও এ সব বাতিক আছে। একগাদা নিয়ে এসেছিলেন।

—কে বালকদা?

—ফিল্ম ডাইরেক্টার বালক দাশগুপ্ত। ঠিক এই জিনিস। আমিই তো ওঁকে—

—আমাকে নিয়ে যাবে সেখানে?

—হাঁ। বলুন, কবে যাবেন?

—ধর, এখনই যদি বেরোই?

—কোনো আপত্তি নেই। আমি স্টুডিও পাড়া যাওয়া বন্ধ করেছি। অগাধ সময় হাতে।

—চল, ব্রেকফাস্ট করে নিই। তারপর বেরিয়ে পড়া যাবে।

রাখী প্রচণ্ড সাজছিল ড্রেসিং টেবিলের সামনে। মেজদা তপন ঘরে ঢুকে চুপচাপ এক মিনিট দাঁড়িয়ে আগুনজ্বালা চোখে তাকে দেখে নিয়ে বলল—তোর লজ্জা হয় না?

রাখী ফোঁস করে উঠল—না। তুমি ঘোমটা ঢাকা দিয়ে বসে থাক, যদি তোমার লজ্জা হয়।

—আশ্চর্য! কাগজে সুপুর ছবি বেরিয়েছে। কাউকে মুখ দেখাতে পারছি নে। আর তুই গলির মেয়েদের মতো সেজে—

—শাট আপ! তোমার পয়সায় সাজছি? ইস্। বড়দার শূন্যস্থান দখল করেছে একেবারে!

—রাখী, আর তোকে এ বাড়িতে ঢুকতে দেব না বলে দিচ্ছি। তুই বেরো—তারপর দেখছি কি করে ঢুকিস!

—আমার যেন জায়গা নেই কোথাও? নেহাৎ মায়ের জন্য এই পচা বাড়িতে পড়ে আছি।

তপন মুখ বিকৃত করে বলল—তা তো আছেই! ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের—কি যেন নাম, যাচ্চলে! সেই ইসের বাড়ি তো? তাই চলে যা! সুপুর একটা ব্যবস্থা হয়েছে। এবার তোর হোক।

বারান্দা থেকে রুগ্ন কণ্ঠস্বরে অরুন্ধতী বললেন—আঃ! কি হচ্ছে তোদের? একটুও শান্তিতে থাকতে দিবি নে তোরা আমাকে?

রাখী ব্যাগ হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল—তোমার ছেলেকে বলে দাও, কক্ষণো যেন আমার পেছনে লাগতে না আসে।

অরুন্ধতী বললেন—তপু, কেন বাবা ওর সঙ্গে ঝামেলা করিস?

—সাধে করি! তপন গলা চেপে বলল—পাড়ায় মুখ দেখাতে পারছি না! আমি বেরুনো পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছি, জান? ভবেশদা

কালই মুখের ওপর বলল, বোনকে একটু শাসন করতে পারলে না এত কাণ্ডের পরও ?

অরুন্ধতী রেগে গেলেন—কাণ্ডটা কি ? জিজ্ঞেস করতে পারলি নে কাণ্ডটা কি ? ইস ! ভবার খুব বড় বড় কথা হয়েছে এখন। ঝুপু নেই কি না, তাই। একদিন তো সে আসবে। তখন দেখব সবাইকে।

রাখী বলল—মা, আমি বেরুচ্ছি। আজ রাত্তিরে না ফিরতেও পারি।

অরুন্ধতী আস্তে বললেন—কোথায় থাকবি রাত্তিরে ?

—উত্তরপাড়ায় নিরু মাসির বাড়ি।

—তাই থাকিস। ও খুশি হবে। নিরুকে বলিস একবার আসতে। আমাদের তো ভীষণ বিপদ চলেছে একটার পর একটা। ওকে বলিস, মা ডেকেছে। দরকার আছে খুব।

—বলব। বলে রাখী বেরিয়ে গেল।

তপন রাগী চোখে তাকে দেখার পর ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বলল—মরুক !

রাখী ততক্ষণে বড় রাস্তার মোড়ে পৌঁছে গেছে। ঘড়ি দেখল সে। আটটা দশ। এখনও গাড়ি আসছে না কেন ? জোক করে বলেনি তো ?

নাঃ। জোক করার লোক নয়। হয়তো কোনো ঝামেলা হয়েছে। কিংবা জ্যামে আটকে গেছে। পাতাল রেলের ঠ্যালায় রাস্তার যা অবস্থা হয়েছে ! রাখী সানগ্লাস খুলে উদ্বিগ্ন মুখে রাস্তা দেখতে থাকল।

সাদা একটা ফিয়াট গাড়ি আচমকা সামনে এসে ব্রেক কষতেই রাখী তাকাল। তার মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।—বাবা ! আমি কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি। পা ব্যথা হয়ে গেল।

অমর্ত্যের চোখে সানগ্লাস। হাত বাড়িয়ে ওপাশের দরজা খুলে দিলেন। রাখী চঞ্চল পায়ে গাড়ির সামনে দিয়ে ঘুরে ওপাশে গেল এবং ভেতরে বসে দরজা বন্ধ করল। সে যখন ছোট্ট মেয়ে ছিল, তার বাবার জন্য এমনি সব গাড়ি আসত। বাবার সঙ্গে সে স্টুডিওতে যেত গাড়ি চেপে। হঠাৎ কথাটা মনে ভেসে এলে সে আনমনা হয়ে পড়ল।

গাড়ি ঘুরিয়ে অমর্ত্য বললেন—টিকটিকির চোটে অস্থির। এক সন অফ এ বিচ সক্কালে এসে মাথাটা গরম করে দিয়ে গেল।

—সেই বুড়ো ডিটেকটিভ ?

—নাঃ। অমর্ত্য একটু হাসলেন। সিগারেট বের করে ধরিয়ে দাও !

—যাঃ! আমি কি সিগারেট খাই নাকি?

—ন্যাকামি কোরো না। আমি দেখেছি।

রাখী অবশ্য প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করছিল—কোথায় দেখেছ বল?

—স্যাটেলাইট বারে। আরও অনেক জায়গায়।

—উঃ! তোমার চোখ সব দিকে। রাখী সিগারেট ধরিয়ে অমর্ত্যের ঠোঁটে গুঁজে দিয়ে বলল—খেতে ইচ্ছে করছে। থাক্, পরে খাব। কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে—তবে।

—ওকে হনি!

—আচ্ছা অমর্ত্যদা! আজ আমাকে তুমি বলছ কেন গো?

—আজ তুমি সাবালিকার মতো ব্যবহার করছ, তাই।

রাখী একটু চুপ করে থেকে বলল—আমরা কোথায় যাচ্ছি?

—ডায়মণ্ড হারবার।

—এই! আমার কিন্তু ভয় করছে। অত দূরে যাবে বলনি তো! অত্তো দূ-রে!

—ভয় কিসের বল তো?

—তুমি বেশি বেশি অসভ্যতা করবে না তো?

—যদি করি, তুমি তো সাবালিকা মাই ডিয়ার!

রাখী ব্যস্তভাবে দরজা খোলার ভান করল—এই! আমাকে নামিয়ে দাও। আমি যাব না।

অমর্ত্য হাসলেন—তুমি দেখছি একেবারে—যাকে বলে পাগলি মেয়ে! চন্দ্রাকে মনে পড়ে? চন্দ্রা—তোমার বন্ধু এবং তোমার বড়দার প্রেমিকা।

—হুঁ। কেন?

চন্দ্রা একবার আমার সঙ্গে ডায়মণ্ড হারবারে গিয়েছিল।

—আমি চন্দ্রা নাকি?

—চন্দ্রা তোমার চেয়ে বয়সে কিছু ছোট ছিল। জাস্ট এইটিন তোমার কত?

—আমার টোয়েন্টি।

—উঁহু। একটু ওঠ আরও।

—স্কুল সার্টিফিকেট দেখাতে পারি।

—ওকে হুনি। তবে তাই! অমর্ত্য গিয়ার চেঞ্জ করে বললেন—চন্দ্রার জন্য আমার দুঃখ হয়। স্বপনই ওর অকালমৃত্যুর কারণ। আমি যদি সুযোগ পেতুম ওকে আরও অনেক দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারতুম। ইডিয়ট স্বপনটা খামোকা আমার সঙ্গে ঝামেলা পাকাল।

—চন্দ্রা বড়দার প্রেমিকা ছিল যে!

অমর্ত্যর চোয়াল শক্ত হয়ে গেল।—প্রেমিকা! কিসের প্রেমিকা? ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের ব্রথেল গার্ল! তার জন্য নিজের অমন ব্রাইট কেরিয়ারটা নষ্ট করে ফেলল স্বপন।

—আজ কাগজে বড়দার ছবি বেরিয়েছে।

—দেখেছি। পাপের বেতন মৃত্যু।

রাখী কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে গেল। তারপর বলল—আচ্ছা, বড়দা ধরা পড়লে কি পানিশমেণ্ট হবে?

—ফাঁসি অথবা যাবজ্জীবন জেল।...বলে অমর্ত্য ঘুরলেন ওর দিকে। —কি? বোনের দুঃখ হচ্ছে তো? সেটা অবশ্য স্বাভাবিক। আফটার অল সহোদর ভাইবোন। বাট স্বপন ইজ এ রিয়্যাল রোগ।

রাখী শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল—নাঃ। বাবাকে মার্ডার করেছে যে তার জন্য দুঃখ হয় না আমার। ওর ফাঁসি হলে কালীঘাটে পুজো দিয়ে আসব।

বলেই সে ঝুঁকে গেল সামনে।—এই অমর্ত্যদা! তোমার কার-রেডিও আছে, আর বলছ না? সে রেডিওর নব ঘোরাতে শুরু করল। একটু পরে বিবিধ ভারতী ধরা পড়ল। চটুল বাজনা এবং গান! রাখী সিগারেটের প্যাকেট থেকে দুটো সিগারেট বের করল। লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে একটা সিগারেট অমর্ত্যের ঠোঁটে গুঁজে দিল।

প্রকৃতি সত্যিই রহস্যময়ী। কোথায় টোরা আইল্যাণ্ড, কোথায় দক্ষিণ বঙ্গ! নদীর ধারে আমবাগানের ভেতর কর্নেল ও সীমন্ত দাঁড়িয়ে অর্কিড দেখছিল। কর্নেলের চোখে বাইনোকুলার। মাঝে মাঝে পাখিও দেখে নিচ্ছিলেন। তারপর বললেন—অন্ততঃ দুটো নমুনা নিয়ে যেতে চাই। কিন্তু অত উঁচু থেকে কি করে পাড়া যায়?

সীমন্ত বলল—কাউকে পাই কিনা দেখি।

—শুধু পেলে চলবে না, সে গাছে চড়তে পারে কি না সেটাই আসল কথা।

সীমন্ত হাসল।—কি বলছেন! গ্রামের লোকেরা প্রত্যেকে গাছে চড়তে পারে।

—একমত নই, ডার্লিং! যাই হোক, দেখ।

সীমন্ত হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল। কোথায় চাতক পাখি ডাকছে। কর্নেল বাইনোকুলার খুঁজতে ব্যস্ত ছিলেন। হুঁ—শিমুল গাছটার ডগায় বসে আছে পাখিটা। ঠোঁট ফাঁক করে আছে। শব্দটা হচ্ছে গলার ভেতরে। বেলা যত বাড়ছে, পশুপাখি সবারই ঠোঁট ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। গ্রীষ্মের তাপ বাড়ছে। অবশ্য বাতাস বইছে হু-হু করে। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে আদিগন্ত জল। নৌকো ভাসছে জেলেদের। একটা পাইলট্-জাহাজ আসছে সমুদ্র থেকে একটা বড় জাহাজকে পথ দেখিয়ে।

মাই গুডনেস! এখানে পাপিয়াও আছে! খুঁজে পাখিটাকে পাওয়া গেল না। এখন পাখিদের মিলনের ঋতু। প্রত্যেকটি পাখি মিলনের তীব্র কামনায় জ্বরোজ্বরো হয়ে আছে। শালিক পাখিরা ঠোঁটে খড়কুটো নিয়ে যাচ্ছে বাসা বাঁধতে। সবাই জন্ম দিতে চায়। তাই ঘর বাঁধার ব্যস্ততা। প্রকৃতি সত্যি বড় রহস্যময়ী। কেন এত জন্ম মৃত্যু—সৃষ্টি এবং ধ্বংসের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া প্রকৃতি জগতে, কে জানে! কিছু বোঝা যায় না।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার। প্রকৃতিতে যেন মৃত্যুর জন্য কোনো বিলাপ নেই, দুঃখ নেই, কান্না নেই। নেপালের জঙ্গলে দেখেছিলেন, সদ্যোজাত হরিণশিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল একটা চিতাবাঘ। হরিণী-মা সেইদিকে তাকিয়ে চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর সামনের ঝোপের পাতার দিকে মুখ এগিয়ে নিয়ে গেল।

হুঁ, প্রকৃতিতে হত্যার জন্য অনুশোচনাও কি আছে? হত্যা এত স্বাভাবিক মনে হয় প্রকৃতিতে। হত্যা যেন এখানে জরুরি নিয়ম। অথচ মানুষ প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়েও অন্যরকম। সে প্রকৃতির বিদ্রোহী সন্তান। মৃত্যুর জন্য সে কাঁদে। হত্যার জন্য সে শাস্তি দেয়।

হতভাগ্য স্বপনের শাস্তি অনিবার্য। পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যে তার বাঁচোয়া নেই। সে নিজেই যেন নিজের ফাঁদে ধরা দিয়েছে। তার বোন তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে। সীমন্ত সাক্ষী দেবে। অমর্ত্যও সাক্ষী দেবেন। সারা দেশ তার বিরুদ্ধে পিতৃঘাতী বলে ধিক্কার জানাবে।

এদিকে রাখী অমর্ত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা শুরু করেছে। স্বপন ্যাবস্কণ্ডার শুনেই হয়তো এটা পারছে। কিন্তু স্বপন এখনও ধরা পড়েনি।

হঠাৎ একটু শিউরে উঠলেন কর্নেল। ষষ্ঠেন্দ্রিয়জাত বোধ একটা নটুইশান যেন মস্তিকের ভেতর ঝিলিক দিল। ওদের সাবধান করে দেওয়া চিত। এ একটা নৈতিক দায়িত্ব তাঁর।

সীমন্ত বলল—অনেক খুঁজে গাছে চড়া লোক পাওয়া গেল। ইউ আর াইট, কর্নেল!

কর্নেল লোকটাকে দেখলেন। আস্ত কঙ্কাল! বললেন— দেখো বাবা, ন আছাড় খেও না গাছ থেকে। আগে ভেবে দেখ, ওই যে ঝালরের মতো গাছাটা দেখছ, ওটা পারতে পারবে কি না?

লোকটা দাঁত বের করল।—কি যে বলেন ছ্যার! গাছেই আমার জম্মো।

সীমন্ত হাসতে লাগল। কর্নেল বললেন—গাছে তোমার জন্ম? তুমি ; হনুমান নাকি হে?

—তা বললেও বলতি পারেন ছ্যার!

বলে লোকটা প্রকাণ্ড আমগাছের গুঁড়িকে তিনবার নমো করে সত্যি ত্যি হনুমানের মতো উঠে গেল।···

দুটো অর্কিডই যথেষ্ট। পরীক্ষা করে দেখবেন, নিশ্চয় কোনো সূক্ষ্ম পার্থক্য াছে। জলবায়ু ভিন্ন, মাটিও ভিন্ন, পরিবেশ ভিন্ন। একই প্রজাতির রগাছা হলেও কিছু বৈষম্য থাকা উচিত।

গাড়ির কাছে ফিরে আসতে আসতে ঘড়ি দেখে কর্নেল বললেন—ডায়মণ্ড ারবারে ইলিশ-ভাত খেয়ে নিলে মন্দ হয় না। এত তাড়ার কিছু নেই, ্ বল সীমন্ত।

সীমন্ত বলল—আমিও তাই বলব ভাবছিলুম।

—তুমি ড্রাইভ কর এবার। আমি পাখি দেখতে দেখতে যাই। প্রচুর াখি এ এলাকায়।

সীমন্তের নিজের গাড়ি আছে। চমৎকার ড্রাইভ করে। আসার পথে ানেকক্ষণ সে ড্রাইভ করেছে। কর্নেল বাইনোকুলারে পাখি দেখছিলেন। ায়মণ্ড হারবারে ঢোকার মুখে হঠাৎ বললেন—মাই গুডনেস!

সীমন্ত বলল—কি কর্নেল?

—হর্নবিল একটা।

না। কর্নেল ট্যুরিস্ট লজের দোতালার ব্যালকনিতে রাখীকে দেখতে পেয়েছিলেন। পাশে অমর্ত্য। মস্তিষ্কের ভেতর যেন বরফের ঢিল গড়িয়ে গেছে এক সেকেণ্ডের জন্য।

বাজারের ভেতরে এক হোটেলের সামনে ব্রেক কষল সীমন্ত।—কর্নেল। সাধুবাবুর এই হোটেলে সেবার দারুণ খেয়েছিলুম ইলিশ-ভাত। দেখতে একা বাজে—কিন্তু রাঁধে অপূর্ব। আগে চেহারা দেখে নিন, পছন্দ হচ্ছে কি না।

—মন্দ কি! কর্নেল বেরুলেন। পেছনে ঘুরে বাইনোকুলারে চোখ দিলেন। ট্যুরিস্ট লজের ব্যালকনিটা দেখা যাচ্ছে। রাখী আর অমর্ত্য নেই তাঁকে দেখতে পেয়ে লুকিয়ে গেল না তো?…

সত্যিই দেখতে পেয়েছিল রাখী। কারণ সে ক্রমশঃ এখানে এসে অতি মাত্রায় সতর্ক হয়ে উঠেছিল। দৈবাৎ চেনা লোকের চোখে পড়ে গেলে কি ভাববে, সেই ভাবনা। কলকাতায় সে সাহসী—দুঃসাহসী। কিন্তু বাইরে এসে এবং অমর্ত্যের হাবভাব লক্ষ্য করে সে আত্মরক্ষার জন্য সচেতন হয়ে উঠছিল ক্রমশঃ। অমর্ত্য একটু অসভ্যতা করেছেন। ক্লাবের টেন্টেও একটু-আধটু করে থাকেন। কিন্তু রাখী এমন অসহায় বোধ করে না নিজেকে। বাইরে এসে তার মনে হচ্ছে, খুব হঠকারিতা হয়ে গেছে।

তারপর হঠাৎ চোখে পড়েছে দাড়িওলা ডিটেকটিভ বুড়োকে—চোখে সেদিনকার মতো বাইনোকুলার। শিউরে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে। লোকটা তাকেই যেন ফলো করে চলে এসেছে। আজই তো তার বড়দার ছবি বেরিয়েছে কাগজে

অমর্ত্য বললেন—কি হল রাখী? অমন দেখাচ্ছে কেন, হনি? চেনা লোক দেখেছ বুঝি?

ভয়ার্ত মুখে রাখী ফিসফিসিয়ে উঠল।—সেই ডিটেকটিভ! আমাদের ফলো করে এসেছে।

—হোয়াট?

—ওই দেখ, লাল গাড়িটা যাচ্ছে। কর্নেলেরই গাড়ি।

—ভুল দেখনি তো? অমর্ত্যের কাঁধ উঁচু আর শক্ত হয়ে গেল মুখের শিরা ফুলে উঠল।

রাখী চাপা স্বরে বলল—সামনে দিয়ে গেল। গাড়ি ড্রাইভ করতে দেখলুম সীমন্তদাকে। আমি ভুল দেখি না!

—কে সীমন্ত ? হু ইজ দ্যাট ফেলো ?

—বড়দার এক বন্ধু। সিনেমা করে। রাখী ব্যস্ত হয়ে উঠল।—না, আর এক মুহূর্ত আমি থাকব না। চল! আমার বড্ড ভয় করছে। এক্ষুণি আমাকে কলকাতা নিয়ে চল অমর্ত্যদা!

বলে রাখী ঘরে ঢুকে ব্যাগ গোছাতে থাকল। অমর্ত্য গুম হয়ে দাড়িয়েছিলেন। ভেতরে এসে বললেন—কি করছ? আই কেয়ার এ ফিগ ফর দ্যাট ব্লাডি হেল ডিটেকটিভ। রাখী, কথা শোনো! আঃ, কি হচ্ছে!

রাখী জেদ ধরে বলল—না, না, না। আমি এক্ষুণি চলে যাব। তুমি যাবে কি না বল!

অমর্ত্য বলল—রাখী! কথা শোনো! যদি ভাল চাও—

রাখী বলল—আমি ভাল চাই না! তারপর দরজা খুলে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল।…

কর্নেল তখনও দাঁড়িয়ে আছেন এদিক ঘুরে। বাইনোকুলার নামিয়ে রেখেছেন। দেখলেন রাখী হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে আসছে। সামনে এলে বললেন—হ্যাল্লো রাখী! কি ব্যাপার? চলে এলে যে?

রাখী কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল—আপনারা কলকাতা ফিরছেন তো?

—হ্যাঁ, কর্নেল হাসলেন। ইলিশ-ভাত খেয়েই ফিরব।

রাখী গাড়ির পেছনের দরজা খুলে ভেতরে বসে পড়ল। সীমন্ত হোটেলের বারান্দা থেকে দৌড়ে এল।—রাখী, তুমি! আরো কান্নাকাটি করছ যে! ব্যাপারটা কি?

রাখী চোখে রুমাল ঢেকে কাঁদছিল নিঃশব্দে। কর্নেল বললেন—আসছি। তারপর ট্যুরিস্ট লজের দিকে হাঁটতে থাকলেন। অমর্ত্য নিচে এসে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে প্রচণ্ড রাগের ছাপ!

কর্নেল খুব কাছে গিয়ে আস্তে বললেন—অমর্ত্যবাবু, ইওর লাইফ ইজ ইন ডেঞ্জার। বি কেয়ারফুল!

অমর্ত্য চেঁচিয়ে উঠলেন—গো টু হেল ইউ ব্লাডি ওল্ড হ্যাগার্ড! আই উইল কিল ইউ!

কথাটা বলেই কর্নেল ঘুরেছেন। আস্তে হেঁটে চলেছেন হোটেলের দিকে। অমর্ত্য তখনও শূন্যে ঘুষি ছুঁড়ছেন পাগলের মতো।



।। ছয় ।।

কর্নেল ড্রয়িংরুমে বসে একটা প্রকাণ্ড বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। ষোল শতকের প্রখ্যাত নাবিক এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানী রিচার্ড হ্যাক্লুইটের সমুদ্রভ্রমণের বৃত্তান্ত। সম্প্রতি বইটির পুনর্মুদ্রণ করেছেন এক মার্কিন প্রকাশক হাফ্‌টন মিফ্‌লিন কোম্পানি। হ্যাক্লুইট ছিলেন অর্কিড পাগল মানুষ। যে দ্বীপে গেছেন, প্রথমে সেখানকার গাছপালায় অর্কিড খুঁজে বেড়িয়েছেন। বর্ণনা দিয়েছেন। স্কেচ করেছেন।

ডায়মণ্ড হারবারের অর্কিডটার সঙ্গে টোরা দ্বীপের অর্কিডের একটা সূক্ষ্ম অমিল চোখে পড়েছে কর্নেলের। প্রথমটার পাতার কিনারায় একটু ঢেউখেলানো ছন্দ রেখায়িত রয়েছে। তা ছাড়া পিঠের দিকটা বেশী খসখসে।

হুঁ, হ্যাক্লুইটের এ ব্যাখ্যাটা যুক্তিসম্মত। বিষুবরেখার দক্ষিণে মকরক্রান্তির আশেপাশে যে সব গাছপালা গজায়, তাদের সঙ্গে বিষুবরেখার উত্তরে কর্কটক্রান্তি অঞ্চলের গাছপালার পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য যত উত্তরে বা দক্ষিণে যাওয়া যায়, তত বাড়ে।

ইউরেকা! কর্নেল নড়ে বসলেন। আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপের কাছে লোবো দ্বীপের যে অর্কিডের স্কেচ দিয়েছেন হ্যাক্লুইট, সেটাই তো এই প্রজাতির। কর্নেল ঝুঁকে পড়লেন বইয়ের ওপর।

কখন কলিংবেল বেজেছে এবং ষষ্ঠীচরণ 'লালবাজারের লাহিড়ীসায়েব'কে এনে এ ঘরে ঢুকিয়েছে। অরিজিৎ গোয়েন্দা দপ্তরের কর্তাব্যক্তি। জুতোর শব্দ না করে পা ফেলতে জানেন। নিঃশব্দেই আসন গ্রহণ করতে পারেন। মুখ টিপে হেসে কর্নেলকে দেখছিলেন। কর্নেল তাঁর দিকে পিঠ রেখে ঝুঁকে আছেন বইয়ের ওপর।

হঠাৎ ওইভাবে থেকেই বলে উঠলেন।—স্বপন ধরা পড়েছে বুঝি?

অরিজিৎ হো হো করে হেসে উঠলেন।—আপনার দেখছি মাথার পেছনেও দুটো চোখ।

—একটা। কর্নেল ঘুরে বসলেন।—পেছনেও দুটো চোখ থাকলে কি স্বপন ধরা পড়েছে কি না জিজ্ঞেস করতুম, ডার্লিং?

অরিজিৎ একটু গম্ভীর হলেন।—কাগজগুলো আমাদের ব্যর্থতাকে ভীষণ ব্যঙ্গ করে কার্টুন-টার্টুন এঁকে এক কাণ্ড করেছে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, এই কেসে হোল পুলিস ফোর্স যতখানি নিজেকে লড়িয়ে দিয়েছে, স্বাধীনতার পর এই পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে আর কখনও এমন করেনি। এমন কি দেশের প্রতিটি রাজ্যের গ্রামে গঞ্জে পর্যন্ত জাল বিছানো হয়েছে। অথচ স্বপনকে পাওয়া দূরের কথা, তার নাগাল পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। তাই—

—তাই? কর্নেল সপ্রশ্ন তাকালেন।

—তাই ধারণা হচ্ছে, স্বপনকে তার কোনো শত্রু খতম করে লোপাট করে ফেলেনি তো? প্রথম কথা—তার সঙ্গে কারুর কারুর ভীষণ শত্রুতার কথা আমরা তো জানিই। যেমন—

—ফুটবল-কোচ অমর্ত্য রায়।

—হ্যাঁ। তারপর বড়তলা এলাকার কুখ্যাত সমাজবিরোধী কালো, যাকে সবাই বলে গলাকাটা কালো। বেনেপুকুরের জাভেদ—রেসের জকি যে। আরও আছে এমন অনেকে, যারা স্বপনের ঘোর শত্রু। কাজেই আমরা সর্বত্র বেওয়ারিশ এবং অজ্ঞাতপরিচয় ডেড-বডির দিকেও নজর রেখেছি। এ পর্যন্ত এমন কোনো বডি পাওয়া যায়নি, যা স্বপনের বলে সন্দেহ হয়।

অরিজিৎ রুমাল বের করে ঘাম মুছলেন। কর্নেল বললেন—গভর্মেন্ট তো দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।

—হ্যাঁ। শুধু খবরের কাগজে নয়, সব পাবলিক প্লেসে স্বপনের ছবি সহ বিজ্ঞাপন লটকে দেওয়া হয়েছে।

—তাহলে ডার্লিং, স্বপনকে তার কোনো শত্রু খতম না করে তোমাদের হাতে তুলে দিতে চাইবে না কি? দশ হাজার টাকা পুরস্কার!

অরিজিৎ সোজা হয়ে বসলেন।—কারেক্ট্। এটা আমাদের—আমার মাথায় আসা উচিত ছিল। সত্যি তো। দশ হাজার টাকাও পাবে এবং শত্রুও টিট হবে। কাজেই স্বপনকে মেরে ফেলার প্রশ্ন আসছে না। কিন্তু একটা কথা। ধরুন, অমর্ত্যবাবুর মতো লোক কি টাকার লোভ করে তাকে পুলিসের হাতে তুলে দিতে যাবেন? অমর্ত্যবাবু তো বড়লোক মানুষ:

—অমর্ত্যবাবু তেমন কিছু করেছেন বলে যতক্ষণ না প্রমাণ হচ্ছে, ততক্ষণ এ কথা আসে না।

—আমরা অমর্ত্যবাবুর প্রতি নজর রেখেছি গাঙ্গুলীবাবুর, মানে মায়াপুরীর সেই টেকনিশিয়ানের কাছে খবর পেয়েই।

কর্নেল মুখ টিপে হেসে বললেন—রেখেছ? বেশ। তাহলে গত ছুদিনে অমর্ত্যবাবুর গতিবিধির খবরও জানো।

—হুঁউ, জানি। বলে অরিজিৎ দ্রুত অ্যাটাচি খুলে নোট-বই বের করলেন।—শুনুন। গত পরশুর আগের রাতে ময়দানে ক্লাবের টেণ্টে ছিলেন অমর্ত্যবাবু। এক মহিলা ওঁকে সঙ্গ দেন রাত বারোটা অব্দি। মহিলাটি অ্যাংলোইণ্ডিয়ান। রোজি স্মিথ নাম। তাকে অমর্ত্যবাবু ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে পৌঁছে দেন। বাড়ির নাম্বার ৪৭।৩।ই, ফ্ল্যাট নং ৯। রোজি ব্রথেল গার্ল। পরদিন সকালে সাতটা নাগাদ ওঁর কাছে যায় স্বপনের বোন রাখী। একটু ফ্লার্টিং দেখা গেছে। সাড়ে আটটায় যান এক দাড়িওলা বুড়ো ভদ্রলোক। অনেকক্ষণ কথা বলেন। রাখীকে তাঁর লালরঙের গাড়িতে চলে যেতে দেখা যায়।

অরিজিৎ হাসলেন মুখ তুলে। কর্নেল বললেন—হুঁ। তারপর?

—দশটায় অমর্ত্যবাবু নিউ আলিপুরে তাঁর ফ্ল্যাটে ফেরেন। ফ্ল্যাট থেকে বেরোন বেলা তিনটেয়। আবার ময়দানের টেণ্টে। সাড়ে পাঁচটায় রাখী আসে আবার। এক ঘণ্টা পরে অমর্ত্য ওকে নিয়ে বেরোন। পার্ক স্ট্রীটের একটা বারে দুজনে ছিলেন ন'টা পর্যন্ত। তারপর রাখী যায় বাসে চেপে। বাসের নম্বর ৯। অমর্ত্য নিউ আলিপুরে। গতকাল সেখানে আমাদের লোক যেতে দেরি করেছিল। বেলা হলে দারোয়ানের কাছে জানতে পারে, সায়েব ময়দানে গেছেন ভোর পাঁচটায়। ময়দানে আমাদের লোক দেখে, আই

বি. ইন্সপেক্টার রণাজৎ বসুর সঙ্গে অমর্ত্যবাবুর কথা কাটাকাটি হচ্ছে। মিঃ বোসকে আমিই বলেছিলাম কথা বলতে। যাই হোক, উনি চলে যাওয়ার আধঘণ্টা পরে অমর্ত্যবাবু গাড়ি নিয়ে বেরোন। ধর্মতলা হয়ে মৌলালি। তারপর প্রচণ্ড জ্যামের মধ্যে ওঁর গাড়িটাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। শেয়ালদায় উড়াল পুল হয়ে সেখানকার জ্যাম এখন মৌলালিতে সরে এসেছে। আমাদের লোককে দোষ দিতে পারছি না। গাড়িটা ছিল ভাড়া করা। ড্রাইভার অত্যন্ত কুঁড়ে প্রকৃতির লোক। তা ছাড়া ভেবে দেখুন কর্নেল, এ তো ইউরোপের কোনো শহর নয়। এঁদো কলকাতা। এখানে কাউকে চোখে রেখে ফলো করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

—হুঁ, তবু যথেষ্ট করেছ তোমরা। তারপর বলছি! ময়দানের টেন্টে আমাদের যে লোক ছিল, সে রিপোর্ট দিয়েছে, বিকেল চারটায় কোত্থেকে ফিরে আসেন অমর্ত্য। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। রাতে আর বাড়ি ফেরেননি। কোনো মহিলাকেও আসতে দেখা যায়নি। তবে প্রচণ্ড মদ খাচ্ছিলেন।

—তাহলে দেখা যাচ্ছে, গতকাল সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত অমর্ত্যবাবু কোথায় ছিলেন তোমাদের জানা নেই।

—কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে ওঁকে আমরা জেরা করে জেনে নিতে পারব। অ্যালিবাই থাকলে প্রমাণ করতে ইনসিস্ট করব।

কর্নেল চোখ বুজে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর উঠে গেলেন বইটা র‍্যাকে তুলে রাখতে। তারপর চুরুট ধরিয়ে বললেন—রোজি স্মিথ?

অরিজিৎ বুঝতে না পেরে বললেন—হ্যাঁ। কেন?

—নামটা সুন্দর।

অরিজিৎ হাসেন।—দেখতেও সুন্দর। কিন্তু যাকে বলে আস্ত ডটার অফ ডেভিল। ওর স্বামী ছিল ইলেকট্রিসিয়ান। এক সময় সিনেমা স্টুডিওতে টেকনিশিয়ানের কাজ করত। গত বছর রোজিকে ডিভোর্স করে অন্য একটা মেয়েকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া চলে গেছে। লোকটার নাম ছিল ক্যারি। স্টুডিও মহলে নাকি পপুলার ছিল।

—সিনেমা স্টুডিওতে?

—হ্যাঁ। কেন?

—এমনি। কর্নেল একটু হাসলেন। স্টুডিও শুনলেই এখন মাথার

ভেতরটা কেমন করে ওঠে! বাই দা বাই, রোজির ঠিকানাটা লিখে দাও। ওর ডিভোর্স'ড স্বামীর নামটাও লিখে দাও।

অরিজিৎ অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন না করে নোট-বইয়ের পাতা ছিঁড়ে ঠিকানাটা লিখে দিলেন। কর্নেল সেটা ড্রয়ারে রেখে বললেন—অমর্ত্যবাবুর ওপর আরও কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা কর, অরিজিৎ।

—ইলেভেন' টাইগার্স টেন্টে আমাদের ইনফরমার আছে। আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, কাজে লাগাতে পারে। পরিমল নামে একটা লোক। বারে থাকে। ওয়েটার।

—মাথায় সন্ন্যাসীদের মতো চুল, মুখে আমার চেয়ে লম্বা দাড়ি, হাফপ্যান্ট—

—মাই গুডনেস! আপনি অসাধারণ অবজার্ভার!

—পরিমল-টরিমল নয়, শক্তপোক্ত লোক চাই। যে খুব চালাকচতুর, বাঘের মতো ক্ষিপ্র! প্রয়োজনে যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে।

অরিজিৎ একটু ভেবে বললেন—আমার এক বন্ধুর ভাই ক্লাবের খেলোয়াড়। প্রদীপ মৈত্র নাম। রাইট ব্যাকে খেলে। খুব খেলাপাগল ছেলে। সারাক্ষণ ময়দানেই পড়ে থাকে। কিন্তু ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন না!

—যে সম্পর্কে আমি নিজেই অন্ধকারে আছি, তোমাকে কেমন করে খুলে বলব ডালিং? কর্নেল আবার চোখ বুজে দাড়ি টানতে থাকলেন। —জাস্ট্ অ্যান ইনটুইশান! আমার খালি মনে হচ্ছে, আবার কিছু ঘটতে চলেছে। যে কোনো মুহূর্তে ঘটে যাবে। কে জানে নিছক কল্পনা কি না! বাট আই স্মেল, অরিজিৎ, আই স্মেল সামথিং অড। বরাবর আমার এটা হয় দেখে আসছি। এইরকম অকারণ অস্বস্তি জেগে ওঠে।

অরিজিৎ তীক্ষ্ণদৃষ্টে লক্ষ্য করছিলেন কর্নেলকে। আস্তে বললেন—তাহলে কি আপনি অমর্ত্যবাবুর ওপর কোনো বিপদের আশঙ্কা করছেন?

কর্নেল জবাব দিলেন না। এতক্ষণে ষষ্ঠী এল কফি নিয়ে। কাঁচুমাচু করে বলল—আপনাকে ঢুকিয়ে সেই তখন বাজারে গেছলুম। বাবুমশাই আজ মাংস খাবেন বলেছিলেন। কি লম্বা লাইন সেখানে! বাবা রে

বাবা দাঁইড়ে আছি তো দাঁইড়েই আছি। লাইন আর ছোট হয় না—লম্বা তো লম্বা।

কর্নেল চোখ কটমট করে তাকাতেই সে ঝটপট কেটে পড়ল। কর্নেল বললেন—কফি খাও ডার্লিং।

—কথাটা তো বললেন না!

—দি কিলার অ্যাট লুজ, অরিজিৎ! খুনী এখনও ধরা পড়েনি, ভুলে যেও না।

অরিজিৎ কফিতে চুমুক দিলেন। মুখে আবছা হয়ে উদ্বেগ ফুটে উঠল এতক্ষণে।···

সীমন্ত তার 'মুনলাইট' স্টুডিওতে কাল ডায়মণ্ড হারবারে তোলা ছবিগুলো ডেভালাপ করছিল। রাখীর গলা শুনে ডার্করুম থেকে বেরিয়ে এল—হাই রাখী!

রাখী বলল—হাই!

আজ তাকে খুব স্মার্ট দেখাচ্ছিল আগের মতো। ভাবা যায় না, কাল ডায়মণ্ড হারবার থেকে আসার সময় সারাপথ গাড়িতে মুখে রুমাল ঢেকে মাথা নিচু করে বসেছিল। কোনো কথা পর্যন্ত বলেনি। কর্নেল ডাকলেও সাড়া দেয়নি। ওদের বাড়ির কাছে বড় রাস্তার মোড়ে পৌঁছুলে মুখ তুলে বলেছিল—থাক, এখানেই নামব। তারপর গাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ঘুরেও তাকায়নি। দ্রুত চলে গিয়েছিল।

সীমন্ত বলল—দাঁড়িয়ে কেন? বস!

রাখী হাসল।—তুমি কি এখন ব্যস্ত সীমন্তদা?

—কেন?

—তোমার সঙ্গে অনেক, অ-নে-ক কথা আছে।

সীমন্ত হাসল।—বেশ তো! এখানে বসেই বল। আমি কাজ করতে করতে শুনি।

রাখী কাউন্টারের কর্মচারীটির দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল। আস্তে বলল—প্রাইভেট কথা বলার জায়গা নাকি এটা?

—প্রাইভেট? ওকে? চল, উল্টো দিকের কাফেতে গিয়ে বসি।

—ভ্যাট! কাফে-টাফেতে নয়।

—তাহলে পার্কে।

—তোমার গাড়িটা কি হল ?

সীমন্ত চোখে ঝিলিক তুলে বলল—আবার ডায়মণ্ড হারবার যেতে ইচ্ছে করছে বুঝি ? আপত্তি ছিল না। কিন্তু তেলের যা দর। অতটা লাক্সারি পোষাবে না।

—তুমি এমন কিপটে ছিলে না তো! বুঝেছি। আমার বেলায় যত—ঠিক আছে। চললুম।

—আরে! তুমি কি সিরিয়াসলি ডায়মণ্ড হারবারে—

—তোমার মাথা! জাস্ট একটু ভিক্টোরিয়া বা গঙ্গার ধার অব্দি গেলেই যথেষ্ট। কে যেতে চেয়েছে ডায়মণ্ড হারবার ?

সীমন্ত একটু দোনামনা করে শেষ পর্যন্ত নিজেকে ঠেকাতে পারল না। কাল রাখীকে ওই অবস্থায় দেখে তার যত কৌতূহল হয়েছে, তত মায়াও জেগেছে মনের ভেতর। প্রখ্যাত চিত্রাভিনেতার মেয়ে। কপালদোষে এমন হয়ে গেছে। উজ্জ্বলকুমার যদি উচ্ছৃংখল বেহিসাবী না হতেন, অন্যান্য হিরোদের মতোই পয়সা জমিয়ে ছেলেমেয়েদের আখের গুছিয়ে যেতে পারতেন। নিজেও পথে বসেছিলেন, এদেরও পথে বসিয়ে গেছেন।

তবে আজ রাখীকে তার দারুণ সুন্দর মনে হচ্ছে! কালকের কান্নাকাটির পর এই হাস্যোজ্জ্বল মুখ। বৃষ্টির পর রোদে দাঁড়িয়ে থাকা ফুলগাছের মতো। সীমন্ত ক্যামেরা নিয়েই বেরুল। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করল।

ভিক্টোরিয়ার কাছে একটু থেমে সে বলল—প্রচণ্ড লোক। চল, গঙ্গার ধারেই যাই।

ছুটির দিন নয় বলে গঙ্গার ধারে লোক খুব কম—তা ছাড়া এখন সকাল ন'টা। নির্জন জায়গা দেখে দুজনে বসল। সীমন্ত সিগারেট ধরিয়ে বলল—বল রাখী!

রাখী একটু অভিমান দেখাল—বল রাখী! তুমি দেখছি বড্ড বেশী কাজের লোক হয়ে গেছ।

সীমন্ত হাসল।—না, ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে।

—জিজ্ঞেস করছ না কেন তাহলে, কাল ডায়মণ্ড হারবারে কেন গিয়েছিলুম ?

—ওক্কে। কেন গিয়েছিলে ?

—একজন আমাকে পটিয়ে-পাটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তার মতলব টের পেয়েই—

—ওয়েট, ওয়েট! তুমি পটলে কেন? তুমি তো বাচ্চা মেয়ে নও!

—আঃ! লোকটা যে আমার খুব চেনাজানা। জাস্ট প্রপোজ্যাল দিয়েছিল—এই যেমন তোমার সঙ্গে গাড়ি করে বেড়াতে এলুম, তেমনি করে যাব। এক্সকার্সান জার্নি। ওঃ! গিয়ে দেখি ট্যুরিস্ট লজ বুক করা আছে।

—অসাধারণ! তারপর?

রাখী গম্ভীর হল আরও।—না, ট্যুরিস্ট লজ বুক করাটাও কোনো ব্যাপার নয়। ও হিন্ট দিয়েছিল, রাতে না ফিরতেও পারি কলকাতা। আমি এমন বোকা যে তাতেও সায় দিয়েছিলুম। আসলে তলিয়ে কিছু ভাবিনি।

—লোকটা অসভ্যতা শুরু করেছিল তো?

—হুঁ। কিন্তু সেজন্যও নয়। হঠাৎ দেখি কর্নেল আর তুমি আসছ! তোমাকে দেখে নয়, কর্নেলকে দেখেই আমি আরও ভয় পেয়ে গেলুম।

—সে কি! কেন?

—উনি ডিটেকটিভ জান না?

—জানি। তাতে কি হয়েছে?

—আমি ভাবলুম, উনি আমাকে ফলো করে বেড়াচ্ছেন। বড়দার ছবি বেরিয়েছে কাগজে।

—যাঃ! সীমন্ত হাসতে লাগল।—আমরা গিয়েছিলুম একটা বাগানে অর্কিডের খোঁজে।

—সত্যি বলছ? গা ছুঁয়ে বল তো!

সীমন্ত ওর হাতের ওপর হাত রেখে বলল—সত্যি বলছি। আমরা জানতুমই না তুমি ওখানে গেছ।

রাখী ঠোঁটের ঘাম রুমালে স্পঞ্জ করে বলল—একটা ভাবনা থেকে বাঁচা গেল, বাবা!

সীমন্ত বলল—কিন্তু তুমি যদি ভয় পেয়েই থাকো কর্নেলকে দেখে, কেন তাঁর কাছেই দৌড়ে এলে?

রাখী হাসল।—আমার তখন শাপে বর হল না? লোকটার হাত থেকে বেঁচে গেলুম। আবার কর্নেলকেও বোঝাতে চাইলুম, বড়দার ব্যাপারে আমার কোনো কানেকশান নেই।

—অর্থাৎ তুমি সারেণ্ডার করলে। সীমন্ত জোরে হেসে উঠল।—এক ঢিলে দুই পাখি বধ। রাখী, তুমি ইনটেলিজেন্ট।

—কিন্তু জান? কাল রাত্তিরে আমার একটুও ঘুম হয়নি। শুধু ভেবেছি, আমার কোনো বিপদ হবে না তো? এর আগে—তোমাকে লুকোব না, পুলিস আমাকে কয়েকবার থ্রেটন করেছে। একবার নিয়েও গিয়েছিল লালবাজারে। শেষে বাবা খবর পেয়ে ছাড়িয়ে আনেন।

—কেন তুমি অমন করে বেড়াও, রাখী? কেন বুঝতে পার না এ পথ সর্বনাশের পথ?

রাখী চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর মুখ নামিয়ে ধরা গলায় বলল—এখন বুঝতে পেরেছি। তাই একটা চাকরির জন্য হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছি। চাকরি করে দেবে বলেই তো ওই লোকটার সঙ্গে কাল—

—লোকটা-লোকটা না করে নাম বলছ না কেন?

—নাম বললে তুমি তাকে চিনবে।

—তাতে কি?

রাখী শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল—অমর্ত্যদা। ফুটবল-কোচ।

সীমন্ত চমকে উঠল, সে কি! সে তো তোমার বাবার বয়সী লোক।

—বাবার বন্ধুও। একসঙ্গে মদ খেতে দেখেছি।

—স্কাউণ্ড্রেল! কিন্তু তুমি তাকে দাদা বলছ যে?

রাখী জবাব দিল না এ কথার। ঠোঁট কামড়ে চুপ করে থাকল। তারপর মুখ তুলে বলল—এখন বুঝতে পারি, চন্দ্রার সঙ্গে আলাপ না হলে এমন হতুম না। বলতে নেই, চন্দ্রা ব্লাডক্যান্সার হয়ে মারা গেছে। কিন্তু চন্দ্রা শুধু আমার নয়, বড়দারও বারোটা বাজিয়ে গেছে। ওর সঙ্গে না মিশলে বড়দার সঙ্গে অমর্ত্যদার ঝগড়া হত না। বড়দা এতদিন বিখ্যাত ফুটবলার হয়ে যেত।

—কে চন্দ্রা?

—একটা মেয়ে ছিল। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে থাকত মিসেস মিশেলের কাছে।

—বাঙালী নাকি—

—বাঙালী। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে অনেক ঘাটে জল খেয়ে শেষে মিসেস মিশেলের পাল্লায় পড়েছিল। আমাকে চন্দ্রা নিজের লাইফের কথা মাঝে মাঝে বলত। অসুখ হওয়ার পর যখনই ওকে দেখতে গেছি, ওই সব কথা বলত। বারো-তেরো বছর বয়সেই চন্দ্রা নষ্ট হয়েছিল। বলত, মাও ভাল

মেয়ে ছিল না। বাবা ছিল ইলেকট্রিসিয়ান। মা ডিভোর্স নিয়েছিল। সব কথা মনে নেই। আরও অনেক স্টোরি শুনেছি ওর লাইফের। তবে বড়দা পুরোটা জানে। বড়দাকে ও ভীষণ ভালবাসত। অথচ কি অদ্ভুত মেয়ে দেখ! বড়দা ওকে যেমনি অমর্ত্যদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল, আর ব্যস! অমনি চন্দ্রা অমর্ত্যদার সঙ্গে ভিড়ে গেল। নেমকহারাম মেয়ে না?

—আসলে এ ধরনের মেয়েরা এমনি হয়ে থাকে। ভবিষ্যতে তুমিও হয়ে যেতে!

রাখী জোরে মাথা দোলাল।—নাঃ। আমি তা হতুম না। কাউকে যদি সত্যি ভালবাসতুম, কখনো তাকে ছেড়ে অন্য কারুর সঙ্গে মিশতুম না।

সীমন্ত চোখে হেসে আস্তে বলল—তুমি কাউকে নিশ্চয় সত্যি করে ভালবাস?

—ভ্যাট! ভালবাসা-টাসা আমার পোষায় না। ও নিয়ে ভাবি না কোনোদিন।

সীমন্ত সিগারেট ধরাল। কিছুক্ষণ চুপচাপ টানার পর বলল—তোমার সত্যি একটা চাকরি দরকার।

—দিচ্ছে কে? যে দেব বলবে, সেই অমর্ত্যদা হয়ে যাবে।

সীমন্ত হাসল। তুমি যেরকম সেজেগুজে থাক, লোভ হতেই পারে। আমারও হয়তো হচ্ছে!

রাখী মৃদু থাপ্পড় মারল ওকে।—কি সেজেগুজে থাকি! ভারি তো একটা বাজে শাড়ি!

—ইউ লুক সেক্সি, রাখী!

—মারব! পুরুষ মাত্রেই এক ধাতুতে গড়া। যাও! আর কথাই বলব না।

রাখী ঘুরে বসল। সীমন্ত হাসতে হাসতে বলল—নাঃ! জোক করছি। তারপর সে একটু গম্ভীর হয়ে বলল—তোমাদের ফ্যামিলির ওপর শনির দৃষ্টি পড়েছে। তোমার বাবা—তারপর স্বপনটার এই ব্যাপার। আই ফিল ফর ইউ, রাখী। বিলিভ মি।

সে উঠল হঠাৎ।—এক মিনিট। ঠিক ওই পোজে বসে থাক তো! নড় না। একটা ছবি নিই।…

বিকেলে কর্নেল ছাদের 'প্ল্যাণ্টওয়ার্ল্ডে' ডায়মণ্ড হারবার থেকে আন
অর্কিড জুটোর দিকে তাকিয়ে আছেন, এমন সময় ষষ্ঠী এসে বলল—
এক মাঠাকরুণ এয়েছেন। মুখখানা চেনাচেনা ঠেকল। তাই বসিয়ে
রেখে এলুম।

—তোর হাতে ওটা কি ?

ষষ্ঠী জিভ কাটল।—ও! উনি দিলেন। ভুলেই গেছি এটার কথা।

কর্নেল হাত বাড়িয়ে কার্ডটা নিলেন। অধ্যাপিকা পারমিতা সান্যাল।
—এখানে ডেকে নিয়ে আয়। আর একটা মোড়া দিয়ে যা। সময়মতো কফি
দিয়ে যাবি কিন্তু।

মানুষের এই এক আশ্চর্য রীতি। যে যাকে ভালবাসে, সে তার দোষ-গুলোকে আমল দেয় না। তাই যেন অতি ভদ্র মেয়েও দুর্দান্ত সমাজবিরোধীর প্রেমে পড়তে ছাড়ে না। হুঁ, নেই-নেই করেও যেন প্রেম নামে একটা বাস্তব ব্যাপার আছে। তা না থাকলে এসব ঘটনা ঘটত না। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে দেবদাসের কথা দিয়ে অনেকে হাসিঠাট্টা করে। কিন্তু দেবদাস কি সত্যি অবাস্তব অসম্ভব চরিত্র? মানুষের পক্ষে সবই সম্ভব।

হয়তো প্রেম অর্থাৎ ভালবাসা মানে একটা ব্যক্তিত্বকেই ভালবাসা। ব্যক্তিত্ব জিনিসটা দেহমন মিলিয়ে একটা অস্তিত্ব। সুন্দর মানুষ জঘন্য কুৎসিতেরও প্রেমে পড়ে থাকে সে কারণে। দেহ নয়, দৈহিক ব্যক্তিত্ব হচ্ছে আকর্ষণের বস্তু। তবে সব জিনিসের মতো প্রেমেরও আসল-নকল আছে হয়তো। সাময়িক ভাললাগা বা মোহ থেকে সম্ভবতঃ নকল প্রেম। আসল প্রেম এই সব বিরল প্রজাপতির অর্কিড আর ক্যাকটাসের মতো বিরল।

পারমিতা আর অমিয়র ব্যাপারটা এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। আসল প্রেম ছাড়া আর কি? অমিয় নেই, তবু পারমিতা এখনও তাঁর কথা ভাবছেন। তাঁর হত্যাকারীর শাস্তি চাইছেন। বোঝা যায়, মনে মনে তাঁকেই পতিত্বে বরণ করে বসেছিলেন।

কর্নেল পেছন ফিরে অর্কিডটা মাচায় একটা মোটা কাঠের টুকরোর সঙ্গে বেঁধে দিচ্ছিলেন। কাঠে একরকমের সলিউশান মাখানো। নিজস্ব আবিষ্কার। অর্কিড দ্রুত শেকড় দিয়ে জড়িয়ে ধরবে কাঠটাকে। প্রেমিক যেমন করে আলিঙ্গন করে তার প্রেমিককে কামনার তীব্রতায় আচ্ছন্ন হয়ে, ব্যাকুল হয়ে।

চোখের কোণা দিয়ে পারমিতাকে দেখে দ্রুত হাসিমুখে ঘুরলেন। ·এই যে!

—আপনার পরিচর্যা দেখছিলুম।

কর্নেল দেখলেন, কখন ষষ্ঠী মোড়া দিয়ে গেছে। ছাদে এলে তাঁর ইরকম তন্ময়তা আসে। তাঁকে যদি কেউ খুন করতে চায়, এই ছাদে এলে ‌া খুব সহজে তা করতে পারে। কে জানে কেন, এখানে এই খোলা ‌াকাশের নিচে মাটি থেকে অনেক উঁচুতে এইসব বিচিত্র উদ্ভিদের কাছে পৌঁছে ‌ যেন তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। জীবনে অসংখ্য হত্যাকারীকে তিনি ‌রিয়ে দিয়েছেন। তাদের শাস্তি হয়েছে। তাঁর কাছে বুদ্ধির চাতুর্যে পরাস্ত ‌য়ে আত্মসমর্পণ করেছে। তাদেরই কেউ না কেউ একদিন প্রতিহিংসা ‌রিতার্থ করতে কি আসবে না? সিঁড়িতে সেই আততায়ীর পায়ের শব্দও ‌ুনতে পাবেন না। কারণ তখন তিনি উদ্ভিদের অন্তর্ভুক্ত—মূক, চক্ষুহীন, ‌ভাষাহীন এক সত্তা। গভীর চেতনার মধ্যে লীন। আর সেই আততায়ী ‌এসে নির্বিবাদে তাঁকে খতম করে যাবে। হতভাগ্য ষষ্ঠী এসে আবিষ্কার করবে বাবামশাই'য়ের রক্তাক্ত মৃতদেহ।

শিউরে উঠে কাঁধ নাড়া দিলেন। পারমিতা বললেন—কর্নেল, আপনি ‌কি অসুস্থ?

একটু হাসলেন।—না। তুমি বসো। বসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে। ‌তাই ডেকেছিলুম।

পারমিতা চারপাশে চোখ বুলিয়ে বললেন—দারুণ! হর্টিকালচারে আপনার এমন নেশা আছে জানতুম না! আমারও অবশ্য একটু নেশা আছে। ‌তবে স্রেফ ফুলের। এত স্পেসও নেই। জাস্ট ব্যালকনিতে কিছু টব।

একটু তফাতে বসে কর্নেল চুরুট ধরালেন।—উজ্জ্বলবাবুর সঙ্গে তো ‌তোমার পরিচয় ছিল। তাই না?

—খুব সামান্য। অমিয়র কাছে আসতেন, সেই সূত্রে যেটুকু আলাপ।

—ওঁর ছেলে স্বপনের সঙ্গে।

পারমিতা মাথা দুলিয়ে বললেন—নাঃ। তাকে চিনি না।

—স্বপনই খুনী সাব্যস্ত হয়েছে, আশাকরি শুনেছ।

পারমিতা অবাক হলেন।—তাই নাকি? জানি না তো। আপনার কাছ থেকে যাওয়ার পর আমি কিছুদিন দার্জিলিঙে ছিলুম। গতকাল ফিরেছি।

তাহলে উজ্জ্বলকুমারের ছেলেই খুন করেছে অমিয়কে? বুঝেছি। বাবার প্ররোচনায় এ কাজ করেছে সে। আপনাকে তো বলেছিলুম, উজ্জ্বলকুমারের এতে হাত আছে। আই ওয়াজ কারেক্ট।

—তুমি কি কাগজ রেগুলার পড়ো না?

পারমিতা ভুরু কুঁচকে বললেন—বিশেষ পড়ি না। তা ছাড়া, আমি এক সপ্তাহ এমন এমন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি, কাগজ সেখানে পৌঁছয় না। একা নয়, সঙ্গে আমার কলেজের একদল ছাত্রীও ছিল। এক্সকার্সান ট্যুর হয় প্রতি বছর গ্রীষ্মে। এবার আমি ওদের নিয়ে গিয়েছিলুম।

—তাহলে উজ্জ্বলকুমারের খুন হওয়ার কথা তুমি জান না?

পারমিতা চমকে উঠলেন।—সে কি! উজ্জ্বলকুমারও খুন হয়েছেন! কবে? কোথায়?

—অমিয়বাবু খুন হবার তুদিন পরে স্টুডিওর ভেতর পুকুরপাড়ে উজ্জ্বলবাবুর ডেডবডি পাওয়া গিয়েছিল। একই ভাবে মাথার পেছনে শক্ত ভোঁতা জিনিস দিয়ে আঘাত।

পারমিতার মুখে বিস্ময়মিশ্রিত আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠল।—তাহলে··· কিন্তু আপনি তো বলছেন উজ্জ্বলকুমারের ছেলে খুনী! নিজের বাবাকে সে খুন করতে পারল?

—পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ অনুসারে তাকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তার মোটিভও খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সব কাগজে তার ছবি ছাপানো হয়েছে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাকে ধরতে পারেনি পুলিস।

—নিজের বাবাকে সে খুন করবে? অমিয়কে করতে পারে।

—পুলিস সেটাই সাব্যস্ত করেছে।

পারমিতা তাকালেন।—আপনি কি সাব্যস্ত করেছেন?

কর্নেল হাসলেন।—আমি পুলিসের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না। কোনো পাল্টা তথ্য আমার হাতে নেই। সত্যি বলতে কি, কেসটা ভীষণ জটিল। যেদিক থেকে তাকাচ্ছি, সেদিকেই একমাত্র স্বপনকে দেখতে পাচ্ছি।

পারমিতা একটু চুপ করে থেকে বললেন—কিছু বিচিত্র নয়। আজকাল যা অবস্থা, ছেলে বাবাকে খুন করাটা তো সামান্য ব্যাপার। মূল্যবোধের যা অবক্ষয় ঘটেছে, তা তো দেখতেই পাচ্ছি সবখানে।

—মিতা, তুমি তো অমিয়বাবুর স্ত্রীকে চিনতে ?

—হ্যাঁ, খুব ডাঁটিয়াল মহিলা ছিল। ভীষণ বদরাগী স্বভাবের। নাম ছিল মৃদুলা। কিন্তু মোটেও মৃদুলা নয়।

—দেখতে সুন্দরী ছিলেন কি ?

পারমিতা একটু হাসলেন।—সুন্দরী বলে মনে হয়েছিল বলেই তো অমিয় বয়সে তার চেয়ে বড় হওয়া সত্ত্বেও ওকে বিয়ে করেছিল। তা ছাড়া মৃদুলা থিয়েটারে পার্ট-টার্ট করত। অমিয়র সিনেমা করতে যাওয়ার পেছনে মৃদুলারই হাত ছিল। নইলে ও তো সাহিত্যের অধ্যাপক। সিনেমার খেয়াল চাপার কারণ ওর বউ। সত্যি বলতে কি, আমি যতটা জানি, মৃদুলাই অমিয়কে স্টুডিওমহলে নিয়ে গিয়েছিল। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল অনেক হোমড়া-চোমড়া লোকের সঙ্গে।

—এক মিনিট। আসছি! বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। ষষ্ঠী কফি আনছিল। তার পাশ কাটিয়ে সিঁড়িতে নামলেন।

ফিরে এলেন একটা খাম নিয়ে। খাম খুলে একটা ছবি বের করে বললেন—উজ্জ্বলবাবুর পাশের মহিলাকে চিনতে পারো নাকি দেখ তো মিতা!

আলো কমে এসেছে। পারমিতা ছবিটা দেখেই বলে উঠলেন—আরে! এই তো অমিয়র বউ মৃদুলা!

কর্নেল ছবিটা ফেরত নিয়ে বললেন—এজন্যই তোমাকে ডেকেছিলুম। নাও, কফি খাও।…



॥ সাত ॥

'ইলেভেন টাইগার্স' ক্লাবের কর্মকর্তাদের মিটিং ছিল বেলা দুটোয়। সেই সঙ্গে লাঞ্চ। সচরাচর মিটিং করা হয় কোনো বড় হোটেলেই। ক্লাবের বহু গোপন আলোচ্য থাকে, যেমন আসন্ন কোনো বড় খেলায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কিংবা অন্য দলের কোনো ভাল খেলোয়াড়কে ভাগিয়ে আনার স্ট্র্যাটেজি —এমন সব বিস্তর বিষয়, যা ক্লাবের টেণ্টে বসে আলোচনা করা চলে না। টেণ্টে সব সময় নানা ধরনের লোকের আনাগোনা। পৃষ্ঠপোষক, সমর্থক, লাইফ-মেম্বার, এমন কি খেলোয়াড়দের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব। এক্ষেত্রে কোনো গোপণতা রক্ষা করা কঠিন।

মূল টেণ্টটা অবশ্য বেশ বড়। কাঠের স্ট্রাকচার, মাথায় কাঠের চালের ওপর ঢালু ঘন সবুজ তেরপলের ছাউনি। দূর থেকে দেখায় প্রকাণ্ড সবুজ হাতির মতো। ভেতরে কাঠের পার্টিসান। বড় অংশটায় বার-কাম-রেস্তোরাঁ। একজন কণ্ট্রাকটার সেটা চালান। বাকি অংশ দুটো ভাগে ভাগ করা। একটা কোচ অমর্ত্য রায়ের জন্য নির্দিষ্ট। অন্যটা কর্মকর্তাদের মিটিং-কাম-ডিসকাসান রুম।

মধ্য রাতে হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি গেছে। দরমাবাতার পেণ্টেড সিলিং চুঁইয়ে জল পড়েছে। গত দু বছর যত্ন করে মেরামত না হওয়ার ফল। লাঞ্চ মিটিংয়ে তাই নিয়ে কর্মকর্তাদের মধ্যে তর্কাতর্কি বেধেছিল। শেষে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত করা হল, আগাগোড়া রিপেয়ার হবে। আগামী জুনের মাঝামাঝি ক্লাবের প্রতিষ্ঠাদিবস। ওইদিন কোনো বড় দলের সঙ্গে ফ্রেণ্ডলি ম্যাচ হবে। একটা

ফাংশান হবে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করা হবে। এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে সিনেমা জগতের বিগ গানরাও ছিলেন। যেমন পরিচালক বালক দাশগুপ্ত। বোম্বের হিন্দি ফিল্মেরও কোনো-কোনো উল্লেখযোগ্য বাঙালী।

বর্তমান কোচ অমর্ত্য রায়ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাসদস্য। কর্মকর্তাদের একজন। মিটিংয়ে অমর্ত্য চিরদিন নীরব মানুষ। কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাঁর নিজের বক্তব্য থাকে না। মিটিংয়ে ঠাট্টা করে তাঁকে বলা হল, টেন্টের দুরবস্থা সম্পর্কে তাঁর মনোযোগের অভাবের কারণ কি এই যে তিনি পশ্চিম জার্মানিতে অফার পেয়েছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে চ'লে যাবেন সেখানে? অমর্ত্য তো এখানেই বাস করেন একরকম। সুতরাং তাঁর ঔদাসীন্যের একটা কারণ থাকা সম্ভব।

একথায় অমর্ত্য খাপ্পা হয়ে ইংরেজিতে বললেন, আমি মিস্তিরি নই, কোচ। আমার চোখ খেলোয়াড়দের জন্য।

বালক দাশগুপ্ত হাসতে হাসতে বললেন—ওকে ঘাঁটিও না ব্রাদার! মাথাটি ইহলোকের গোলের ওপর দিয়ে ওভারশট করে একেবারে স্বর্গে পাঠিয়ে দেবে।

ঠাট্টা করছিলেন শিল্পপতি জগন্ময়কুমার। বললেন—উঁহু, নরকে। স্বর্গে যাবার মতো পুণ্য আমরা করিনি।

দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার প্রধান সম্পাদক এবং মালিক প্রণবেশ মজুমদার চোখ টিপে অমর্ত্যকে কটাক্ষ করে বললেন—অমর্ত্য, তুমি কোথায় যাবে? কতটা পুণ্য করেছ?

অমর্ত্য বাঁকা হেসে বললেন—নরকে। পুণ্য সঞ্চয় করতে দিল কৈ বাস্টার্ডরা?

বালকবাবু বললেন—তারা আবার কারা?

অমর্ত্য জবাব দিলেন না। হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরালেন। লাঞ্চ খেতে খেতে মিটিং চলেছে। আঠারোজন কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র তেরজন হাজির। কোরাম দুই-তৃতীয়াংশ এলেই। হোটেলে হলে উপস্থিতি পুরো হয়। একটু পরে ব্যাপারটা খেয়াল হল বালকবাবুর।—মাই গড! উই আর আনলাকি থার্টিন!

প্রাক্তন খেলোয়াড় সুদীপ্ত বসাক মুর্গির ঠ্যাং কামড়ে ধরে বললেন—বোগাস! যত্তোসব কুসংস্কার!

—কলোনিয়াল লিগ্যাসি। মন্তব্য করলেন নচিকেতা বসু—প্রখ্যাত বাঙালী মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী।—ব্রিটিশরা ছিল খ্রীস্টান। আমাদেরও অনেকটা খ্রীস্টান করে গেছে।

সবাই হেসে উঠলেন। অমর্ত্য বাদে। অমর্ত্যর লাঞ্চে মনোযোগ কম। ক্রমাগত হুইস্কি পান করে যাচ্ছেন। আবার প্রসঙ্গ বদলাল। মূল বিষয়ে ফিরে এলেন সদস্যরা। শীগগির টেন্ট মেরামত, স্টেডিয়াম রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, ব্যায়ামাগারের কিছু নতুন সরঞ্জাম কেনা, বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের জন্য তিনটে সাবকমিটি গঠন—সবেতেই সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হল।

টেন্ট মেরামতের দায়িত্ব দেওয়া হল বালকবাবুকে। বরাবর তাঁকেই দেওয়া হয়। কন্ট্রাক্টার তাঁর কাছের লোক। সিনেমা স্টুডিওর সঙ্গে জড়িত। বালকবাবু সিলিং দেখতে দেখতে বললেন—ইলেকট্রিক ওয়ারিংয়ের অবস্থাও দেখছি খারাপ। শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন ধরে গেলে কেলেঙ্কারি হবে।

সভাপতি প্রাক্তন বিচারপতি নগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু বললেন—একই সঙ্গে করে ফেল। এতে আর কথা কি? থরো রিপেয়ার করা হবে। আলাদা রেজিলিউশানের দরকার নেই। একই হেডে অ্যাকাউন্ট সাবমিট করতে বলবে কন্ট্রাক্টারকে।

সর্বক্ষেত্রে কিছু লোক থাকেই, যারা উল্টো কথা তোলে। পৃষ্ঠপোষক সদস্য জ্ঞানরঞ্জন ভাদুড়ী বললেন—টেণ্ডার ডাকা উচিত ছিল। টেণ্ডার কল করে লোয়েস্ট রেটে—

নগেন্দ্রনাথ বাঁকা হেসে বললেন—ওয়েট। তুমি তো রাইটার্সে হেডক্লার্ক না কি ছিলে যেন?

ভাদুড়ী গম্ভীর হয়ে বললেন—ডেপুটি ডাইরেক্টার অফ স্টেট প্ল্যানিং।

—সে তো হেডক্লার্ক থেকে প্রমোশন পেয়ে। অরিজিন্যালি তুমি ছিলে মাছিমারা কেরানি।

হাসির রোল পড়ে গেল। ভাদুড়ী রাগ করে দ্রুত চিবুতে থাকলেন। রোগা মানুষ কিন্তু ব্লাডপ্রেসার হাই। তাঁকে বরাবর কেউ পাত্তা দেয় না। মনে অভিমান আছে।

প্রাক্তন বিচারপতি বাঙালীর কেরানি মনোবৃত্তি এবং লালফিতের উদ্ভব যে বাঙালীর হাতে, এ সম্পর্কে দীর্ঘ ভাষণ দিতে দিতে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল। বালকবাবু টুথপিক তুলে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে বললেন—সরলদা ইজ এ

রপুটেড কন্ট্রাক্টার। সিনেমা লাইনের সব কাজ তাঁর প্রায় একচেটিয়া। সেট তরিতেও তাঁর সাহায্য চাইতে হয়। এক্সট্রার দরকার হলে তিনিই ভরসা। লাইটিং পর্যন্ত। কারণ তাঁর হাতে প্রচুর স্কিলড ইলেকট্রিসিয়ান আছে। তা ছাড়া, মনে প্রাণে ভীষণ বাঙালী। আমাদের চেয়েও। এই ইলেভেন াইগার্সের কত বড় সমর্থক সরলদা, আমরা আশাকরি, তা জানি।...

অমর্ত্য বেরিয়ে গিয়ে অমলতাস গাছটার ছায়ায় দাঁড়ালেন। ক্লাবের ারাক্ষণের ভৃত্য জগাই একটা বেতের চেয়ার দিয়ে গেল। অমর্ত্য বসলেন। াতে হুইস্কির গ্লাস। তারপর মুখ ঘুরিয়ে রাইট ব্যাক প্রদীপ মৈত্রকে দেখতে পয়ে বললেন—প্রদীপ, এখানে এত তো!

প্রদীপ স্বাস্থ্যবান তরুণ। তার হাঁটা চলার ভঙ্গিতে খেলোয়াড়ী ছন্দ আছে। াছে এসে বলল—অমর্ত্যদা, মিটিং শেষ হল?

—হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কি করছ এখন?

—আমি তো সারাদিনই থাকি প্রায়।

অমর্ত্য মুখ তুলে ওর চোখে চোখ রেখে বললেন—কাল থেকে লক্ষ্য করছি, তক্ষণ আমি ক্লাবে আছি, সব সময় তুমি আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করে বড়াচ্ছ। আমার নজর সবখানে—মাইণ্ড ছ্যাট!

প্রদীপ আমতা হাসল।—না, না! ও কি বলছেন অমর্ত্যদা?

—দিস ইজ ব্যাড! অমর্ত্য রাগ করে বললেন। কাল সন্ধ্যায় আমি য়লেটে ঢুকেছি। জানলা দিয়ে দেখি, তুমি এদিকে তাকিয়ে আছ। তারপর ামি স্যুইমিং পুলের কাছে গেলুম। দেখি, তুমিও হাজির। আমি এ সব ছন্দ করি না।

প্রদীপ ব্যস্ত হয়ে বলল—না, না। জাস্ট—এমনি—মানে—

অমর্ত্য আরও খাপ্পা হয়ে বললেন—হোয়াই আর ইউ শ্যাডোয়িং মি? থনই তাকাচ্ছি, তোমাকে দেখতে পাচ্ছি।

—প্লিজ অমর্ত্যদা, ব্যাপারটা এভাবে নেবেন না।

—খবর্দার, তুমি আমার পেছনে ঘুরঘুর করবে না। কোচিংয়ের ময় আমি কিছু মনে করি না। বরং আমার দিকে চোখ রাখলে আমি শি হই। কিন্তু কোচিং পিরিয়ডের বাইরে আমি আলাদা লোক। াও, গো!

প্রদীপ নার্ভাস হয়ে চলে যাচ্ছিল ব্যায়ামাগারের দিকে। অমর্ত্য তাকে

হঠাৎ ডাকলেন। কাছে এলে আস্তে বললেন—আই লাইক ইউ প্রদীপ তুমি—তুমি আমার স্বপ্ন। কিন্তু দিস ইজ ব্যাড—ভেরি ব্যাড।

প্রদীপ চলে গেল। টেন্ট থেকে কর্মকর্তারা বেরিয়েছেন। অনেকে গেটের দিকে চলেছেন। বালকবাবু অমর্ত্যের কাছে এসে বললেন—তোমার কি হয়েছে বল তো অমর্ত্য ?

—কি হবে ?

বালকবাবু হাসলেন।—হয়তো অনেকদিন পরে তোমাকে দেখছি বলে একটা চেঞ্জ ধরা পড়ছে।

জগাই চেয়ার নিয়ে দৌড়ে এল। অমর্ত্য বললেন—নো চেঞ্জ, বালক। তোমার চোখে কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। সিট ডাউন।

বালকবাবু বসে বললেন—ওই তো ! আগের মতো নাবালক না বলে বালক বললে !

অমর্ত্য দুর্লভ হাসি হাসলেন।—কি ছবি করছ ?

—করছি একখানা। না করলে নয় বলেই।

—কেন ? উদ্দীপনা কমার কারণ কি ?

—বাংলা ছবির বাজার। তার ওপর হিরোর আকাল ! হিরোইনও তেমন কোথায় আর ? সেই বোম্বে ছোটো। অত টাকা ইনভেস্ট করবে কোন প্রডিউসার ?

—মণিদীপার সঙ্গে গণ্ডগোল নেই তো তোমার ? তাকে নিয়ে এস। কম টাকায় রাজি হবে।

বালকবাবু চোখে ঝিলিক তুলে বললেন—তোমারই প্রেমিকা। বলে দাও ওকে।

– ধুস ! অমর্ত্য মুখ বিকৃত করলেন। শি ইজ এ প্রফেশনাল হোর !

– যাঃ ! সব্বাইকে হোর বলা অভ্যাস তোমার।

—অমিয় আর উজ্জ্বল বেঁচে থাকলে প্রমাণ দিতুম।

বালকবাবু গম্ভীর হলেন।—পরপর দুজনের খুন হওয়াটা ভারি অদ্ভুত ব্যাপার ! বাচ্চু বলছিল, উজ্জ্বলের ছেলে স্বপনই নাকি খুন করেছে। পুলিস তাকে খুঁজে হন্যে হচ্ছে। কিন্তু ছেলে বাবাকে খুন করেছে, এ আমি বিশ্বাস করি নে ভাই ! এখনও দেশটা অতখানি নরক হয়ে যায়নি।

অমর্ত্য গেলাস শেষ করে বললেন—স্বপন ইজ এ রিয়্যাল বাস্টার্ড।

আমার হাতের তৈরি সেন্টার ফরোয়ার্ড ছিল শুওরের বাচ্চা। নিজের দোষে ভাগাড়ে যাচ্ছে।

—স্বপনকে কিন্তু খুব সরল ছেলে মনে হত আমার। একটু জেদী বা গোঁয়ার ছিল, এই যা।

অমর্ত্য উঠে দাঁড়ালেন।—একটু রেস্ট নেব। তুমি এখন থাকছ, না চলে যাচ্ছ ?

—কিছুক্ষণ আছি। ফোন করেছি সরলদাকে। ও আসছে। টেন্টের অবস্থাটা দেখে যাক।

অমর্ত্য টেন্টে ঢুকলেন। নিজের ঘরে ঢুকে ফ্যানের সুইচ অন করে দিলেন। শুয়ে পড়লেন ক্যাম্পখাটে। একটু পরে কাত হয়ে জানালার দিকে তাকাতেই দেখলেন, পেছনে ফুলগাছের ভেতর টেন্টের ছায়ায় প্রদীপ দাঁড়িয়ে আছে। চোখে পড়তেই সে আড়ালে সরে গেল। অমর্ত্য রাগী চোখে তাকিয়ে রইলেন।..

দিনে ঘুমোন না অমর্ত্য। কিন্তু আজ কেমন ক্লান্তিতে ঘুমঘুম একটা আচ্ছন্নতা এসে চোখের পাতা টেনে ধরছে। অথচ প্রদীপ—

প্রদীপ এমন করছে কেন ? আজই প্রচণ্ড চার্জ করে জেনে নেবেন। ছেলেটা খেলোয়াড় হিসেবে বুদ্ধিমান। কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে যেন নির্বোধ। তার আচরণে অনেক সময় বাচ্চা ছেলের আদল বেরিয়ে আসে।

ঘণ্টা দুই চোখ বুজে থাকার পর অমর্ত্য উঠে পড়লেন। আজ বিশ্রামের দিন। এদিনে কোচিং বন্ধ। তবু খেলোয়াড়রা আসে। আজ এসেছে। কয়েকটা বল এদিকে-ওদিকে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। অমর্ত্য পেছনের টয়লেটে গিয়ে ঢুকলেন। ছোট্ট ঘুলঘুলি দিয়ে তাকিয়ে প্রদীপকে দেখতে না পেয়ে স্বস্তি হল।

কিন্তু বেরিয়ে এসেই দেখলেন, প্রদীপ বল নিয়ে টেন্টের কাছাকাছি ঘুরছে। পোশাক বদলে এলেন অমর্ত্য। বারের ভেতর কন্ট্রাক্টার আর তার দুজন লোক ফিতে নিয়ে মাপজোক করছেন। বালকবাবু এখনও যান নি।

অমর্ত্যকে দেখে প্রদীপ বল নিয়ে দৌড়ে এল।—অমর্ত্যদা কি চলে যাচ্ছেন ?

অমর্ত্য রুক্ষ স্বরে বললেন—কেন ?

প্রদীপ হাসল—না। এমনি—মানে—

অমর্ত্য গেটের কাছে গিয়ে স্বগতোক্তি করলেন—বাস্টার্ড! তারপর হঠাৎ ঘুরে ডাকলেন জগাইকে। বললেন—তোমার ম্যানেজারবাবুকে বল, রাত্রে থাকছি। ফিরব ন'টা নাগাদ। একটা লাইট ডিনার রেডি রাখে যেন। বুঝতে পেরেছ?

জগাই মাথা দোলাল। বুঝেছে।

•

কর্নেল ছাদের কোণায় সরু তারের জাল দিয়ে ঘেরা চার ফুট বাই তিন ফুট এবং উঁচু পাঁচ ফুট খাঁচাটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ওপরে টিনের ছাদ। ছাদটার ওপরে ও তলায় সবুজ রঙ করেছেন নিজের হাতে। জালও সবুজ করে দিয়েছেন। মেঝেয় কাঠের পাটাতনে ইঞ্চি চারেক পুরু ঘাসের চাবড়া বসিয়েছেন। চাবড়াগুলো টেম্পো বোঝাই করে এনে দিয়েছে মেহের আলি—যার বসবাস পেছনের বস্তিতে। ধাপার দিক থেকে এনেছে কষ্ট করে। দামও নিয়েছে ভাল রকমের।

ঘাসের ভিতর বালি ছড়াচ্ছিলেন এতক্ষণ। মরুপ্রজাপতি দম্পতির স্থায়ী ডেরা এটা। বর্ষার ব্রিডিং গ্রাউণ্ড। যতটা পারা যায়, মরু এলাকার স্বাভাবিক ব্রিডিং গ্রাউণ্ডের নকল করা। কয়েক টুকরো কাঠ আর পাথর ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। প্রজাপতি দুটো পাথরে বসে আছে। কখনও শুঁড় দিয়ে এ ওকে স্পর্শ করছে। এই কি ওদের প্রেমের প্রকাশ?

জলের সরু রবার পাইপ আনতে পা বাড়িয়ে দেখতে পেলেন সীমন্ত ও রাখী কখন এসে একটা প্রকাণ্ড ক্যাকটাসের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। হেসে ফেললেন। —নটি চিলড্রেন! কি দুষ্টুমির মতলব ভাঁজছ চুপি-চুপি এসে?

সীমন্ত কি বলতে যাচ্ছিল, রাখী তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—সীমন্ত বলছিল ডিটেকটিভদের নাকি পেছনেও চোখ থাকে। তাই—

—কি দেখলে?

—নেই।

কর্নেল জলের পাইপটা নিয়ে গিয়ে প্রজাপতির ঘরের মেঝে ভেজাতে ভেজাতে বললেন—হুঁ। কে কাকে ধরে নিয়ে এসেছ, বল! সীমন্ত তোমাকে, না তুমি সীমন্তকে?

রাখী মুখ টিপে হেসে বলল আপনিই বলুন।

—তুমি কি আমার বুদ্ধির দৌড় পরীক্ষা করতে এসেছ রাখী?

—ধরুন, তাই।

কর্নেল চাপা গলায় চোখে হেসে বললেন—সীমন্ত তোমাকে নিয়ে এসেছে!

—কোত্থেকে?

—হুঁ, মেট্রোর সামনে থেকে।

—এই! রাখী অস্ফুট চিৎকার করে সীমন্তের দিকে তাকাল। সীমন্ত একটু হাসল। তারপর রাখী আব্দারের গলায় বলল—কর্নেল! বলুন না কেমন করে জানলেন? আঃ, বলুন না! না বললে আপনার সঙ্গে এই শেষ।

কর্নেল জলের পাইপের মুখ এঁটে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।—শেষ হলে তো তুমি যা বলতে এসেছ, তা বলা হবে না। রাজা মিদাসের সেই গল্পটা জান তো? নাপিত আর রাজা মিদাস! কিং হ্যাজ অ্যাসেস ইয়ার্স!

রাখী অবাক হয়ে চোখ বড় করে তাকাল।—আপনি ম্যাজিসিয়ান কর্নেল!

—না ডার্লিং! একটু চেষ্টা করলে তুমিও বলতে পারতে যে আমি যখন ওই প্রজাপতি দুটোকে দেখছিলুম, তখন আসলে কাদের দেখছিলুম।··· কর্নেল নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন হো-হো করে।

রাখী লজ্জায় রাঙা হয়ে অস্ফুট স্বরে বলল—ভ্যাট্! খালি বাজে কথা।

কর্নেল বললেন—সীমন্ত তোমাকে, না তুমি সীমন্তকে নিয়ে এসেছ—একথা যখন জিজ্ঞেস করলুম, তুমি আমার কথার উদ্দেশ্য বুঝতে পারনি। কিন্তু সীমন্তই যে তোমাকে নিয়ে এসেছে তা বলতে বুদ্ধির বিশেষ দরকার হয় না। কারণ সীমন্তর গাড়ি আছে। কাজেই সীমন্ত তোমাকে নিয়ে এসেছে।

—কিন্তু মেট্রোর সামনে থেকে জানলেন কিভাবে?

—তোমার জুতোয় কালো বালি কাদা লেগে আছে। কিন্তু সীমন্তর জুতো পরিষ্কার। তার মানে সীমন্ত গাড়িতে বসে ছিল। তুমি তার জন্য অপেক্ষা করছিলে। গাড়ি আসতেই দৌড়ে গেছ। এবার দেখ, সীমন্ত থাকে দক্ষিণে, তুমি উত্তরে। তাহলে এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে তুমি অপেক্ষা করছিলে, যেখান থেকে গাড়িতে উঠতে হলে তোমার জুতোয় কালো বালি কাদা লাগবে।

সেটা মেট্রো সিনেমা ছাড়া আর কোথায় হবে? তুমি মেট্রোর বারান্দার তলায় দাঁড়াবে এটাই স্বাভাবিক। কারণ রোদ্দুর ছিল। সীমন্তর গাড়ি দক্ষিণ থেকে আসছে। কাজেই রাস্তার বাঁ দিকে পাতাল রেলের জন্য খোঁড়া মাটির পাশেই তাকে গাড়ি রাখতে হবে। তোমাকে যেতে হবে রাস্তা পেরিয়ে এবং দাঁড় করানো গাড়িতে উঠতে হবে। বাঁ দিকের দরজা খুলে ওইদিকটায় পাতাল রেলের কালো বালি কাদা ডাঁই হয়ে আছে। এ বালি কাদা কলকাতার পাতালের।

—জায়গাটা অন্য কোথাও হতে পারত। মেট্রো কেন?

—মেট্রো চিরদিন একটা রেদেঁভ্যু। সাক্ষাতের জায়গা হিসাবে ওর একটা ঐতিহ্য আছে, ডার্লিং! উত্তরের মেয়ের জন্য দক্ষিণের ছেলে এলে তাকে ওখানেই অপেক্ষা করতে হবে এবং ওর উল্টোটাও সত্য। সীমন্ত তো তোমার জন্য বেলগাছিয়ায় অপেক্ষা করতে যাবে না।

রাখী হাততালি দিয়ে হেসে উঠল। তারপর বলল—আমি কিছু বলতে এসেছি কি করে জানলেন?

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন—আমাকে বলার মতো কথা সীমন্তের চেয়ে তোমারই থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশী। তুমি আমাকে ডিটেকটিভ হিসেবে জান। কাজেই সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত কথা ছাড়া তোমার আর কি বলার থাকতে পারে আমার কাছে? তা ছাড়া এই কেসের সন্দেহ-ভাজন লোকটি তোমার দাদা। তোমার তাগিদটাই তীব্রতর হওয়া উচিত।

রাখী একটু গম্ভীর হল এবার।—এমনি বুঝি আসতে পারি না আপনার কাছে?

কর্নেল খুরপি নিয়ে একটা ক্যাকটাসের টবের গোড়ার মাটিতে আঁচড় কাটতে কাটতে বললেন—হয়তো পার। কিন্তু সীমন্তের মুখ দেখে বুঝতে পেরেছি, সে উদ্বিগ্ন। সে এতক্ষণ চুপচাপ এবং অন্যমনস্ক। কাজেই গোড়ায় যে প্রশ্নটা করেছিলুম—কে কাকে নিয়ে এসেছে, তার লক্ষ্য ছিল ভিন্ন। হুঁ, সীমন্ত তোমাকে গাড়ি করে নিয়ে এসেছে, এটা আক্ষরিকভাবে সত্য। কিন্তু সীমন্তের হাবভাব বলে দিচ্ছে, তুমিই তাকে আমার শরণাপন্ন হতে প্ররোচিত করেছ। তোমার হাবভাবে ড্যামকেয়ার থাকার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। অতএব এই সব তথ্য থেকে আমার ডিডাকশান হল: তোমার বড়দা স্বপনের সঙ্গে সীমন্তের সাক্ষাৎ ঘটেছে এবং তাকে সে শাসিয়ে গেছে।

রাখী আরও গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে রইল। সীমন্ত আস্তে বলল—কাল সন্ধ্যায় স্বপন আমার স্টুডিওতে গিয়েছিল। হঠাৎ ঢুকে বলল, রাখীকে তোর যদি বিয়ে করার সাহস এবং উদারতা না থাকে, তুই ওর সঙ্গে মিশিস না। আর একটা কথা। রাখীকে বলিস, ফুটবল কোচ অমর্ত্য রায়ের ত্রিসীমানায় গেলে বোন বলে ক্ষমা করব না। জানিস তো আমি নিজের বাবাকেও ছেড়ে কথা কইনি? কথাগুলো বলেই তক্ষুণি বেরিয়ে গেল।

রাখী বলল—এবার আমার কথা বলি, বড়দাকে আমি আর ভয় করি নে। আমি যা খুশি করব। আর—

কর্নেল তার মুখের দিকে তাকালেন। রাখীর মুখে নি র প্রতিহিংসার রেখা দেখে অবাক লাগল না। সামাজিক ঘেরাটোপের বাইরে যে মেয়ে হাঁটতে পেরেছে, সে খুব সহজে তথাকথিত আনসোস্যাল এলিমেন্টদের মতোই প্রতিহিংসাপরায়ণা হতেই পারে। এক যদি সীমন্ত ওকে ভালবাসা ও যত্নে টেনে নেয়, ও বাঁচবে। মূল্যবোধের খানিকটা এখনও হয়তো ওর মধ্যে টিকে আছে। নইলে অমর্ত্যের কাছ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসত না। সহোদর দাদা স্বপনকে ঘৃণা করত না। ডায়মণ্ড হারবার থেকে ফেরার সময় ওর সারাপথ নিঃশব্দ কান্না গভীর অনুশোচনারই ফল। কর্নেল দেখছিলেন, ও 'আর' বলে চুপ করে আছে। বললেন—আর তুমি স্বপনকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করবে। তাই তো?

—হুঁ। আমি জানি, বড়দা কোথায় লুকিয়ে থাকে।

—কোথায়?

—এয়ারপোর্টে যেতে ভি আই পি রোডের ডাইনে যে কলোনিটা আছে, সেখানে।

কর্নেল মাথা দুলিয়ে বললেন—হ্যাঁ। বুঝেছি। প্রফুল্ল কলোনির কথা বলছ। এখন তো ঘনবসতি হয়ে গেছে।

—আমার পিসতুতো দাদা মনোরঞ্জন থাকে ওখানে। মনোদা পুলিস অফিসার। কোন্ থানায় আছে এখন, জানি না।

কর্নেল হেসে উঠলেন।—সর্ষের মধ্যে ভূত থাকে। তাই স্বপনকে পুলিস ধরতে পারছে না! সুরক্ষিত দুর্গ।

রাখী হিসহিস করে বলল—মনোদা মাকে বলে গেছে। মা আমাকে চুপিচুপি বলেছে। কিন্তু আর না—বড়টা খুব বাড়াবাড়ি শুরু করেছে।

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন।—শোন। সীমন্ত, তুমিও শোন। একথাটা আর কাকেও যেন ভুলে বল না। স্বপনের ব্যাপারে আমিই যা করার করছি। কাছে এস। তোমরা দুজনেই আমাকে ছুঁয়ে প্রমিস কর।

ডি সি ডি ডি অরিজিৎ লাহিড়ী ফোন তুলে বললেন—লাহিড়ী।

মহিলা অপারেটারের গলা ভেসে এল।—কথা বলুন স্যার! মিঃ পরিতোষ মজুমদার।

অরিজিৎ বললেন—বলুন মিঃ মজুমদার।

—স্যার, অমর্ত্য রায় বেলা সাড়ে চারটে নাগাদ ফ্রিস্কুল স্ট্রিটে গিয়েছিলেন।

—সো হোয়াট?

—শুনুন স্যার! জেভিয়ার বুড়োকে তো চেনেন। সেই যে মিসেস মিশেলের ইয়ে।

অরিজিৎ হাসলেন। —হুঁ, কেপ্ট্। ইস্টার্ন রেলে চাকরি করত একসময়। বলুন।

—অমর্ত্যবাবুর সঙ্গে বুড়োর কি নিয়ে ঝগড়া হচ্ছিল। আমাদের লোক ছিল বাড়ির সামনে। অমর্ত্যবাবু বুড়োকে মেরেই ফেলতেন। রাস্তার লোকেরা এবং আমাদের লোক মিলে ছাড়িয়ে দেয়। বুড়ো শাসাচ্ছিল ওঁকে গুণ্ডা লেলিয়ে দেবে বলে। জেভিয়ারের হাতে গুণ্ডা অবশ্য আছে। কিছু অ্যাংলো ছোকরা যেভাবে মুখিয়ে ছিল, অমর্ত্যবাবুর ভাগ্যেও কিছু ঘটে যেত। আমরা ঠেকাতে পারতুম কি না বলা যায় না।

—কেন? কনফারেন্সে আপনাকে এবং মিঃ বোসকে বিশেষভাবে বলা হয়েছে ওঁর সেফটির ওপর নজর দিতে।

—আসলে রোজি স্মিথের জন্য বাড়ির সামনে দুজন লোক রেখেছিলুম। অমর্ত্যবাবু ওখানে হাজির হবেন চিন্তা করিনি। ওঁকে ফলো করে এসে মিঃ বোস একটু তফাতে গাড়ি রেখেছিলেন। লোক দুটোর কাছে আর্মস ছিল না। মিঃ বোস ঘটনাস্থলে পৌঁছুবার আগেই কিছু ঘটে যেত।

—যাক গে, বলুন।

—রোজি বেরিয়ে এসে অমর্ত্যবাবুকে টানতে টানতে ওঁর গাড়িতে ঢুকিয়ে দিল। তারপর নিজেও ঢুকল। দুজনে পার্ক স্ট্রিটের পার্ল হোটেলে গেল। পার্লের কারবার তো জানেন স্যার! রোজির ওখানে বিভিন্ন

নামে রুম বুক করা থাকে। ওরা বেরুল একেবারে সাড়ে আটটা নাগাদ। তারপর রোজিকে মিসেস মিশেলের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে অমর্ত্যবাবু ময়দানের টেণ্টে গেলেন। পরিমল এইমাত্র খবর দিল, আজ রাতেও টেণ্টে থাকবেন।

—কাছাকাছি পুলিস-ভ্যান রাখুন, অ্যাজ এ রুটিন আফেয়ার। ওয়াচ করতে বলুন।

—আছে স্যার। সাঁতরা আছে। পাকা লোক।

—ওকে। জেভিয়ারের সঙ্গে ঝগড়ার ব্যাপারটা খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল।

—নিয়েছি স্যার। নিচের তলায় আমাদের ইনফর্মার আছে। মিস কেটি।

—কি বলল সে?

—অমর্ত্যবাবু কি সব জিনিস ফেরত চাইছিলেন। জেভিয়ার কিছুতেই দেবে না। তার কথা হল, অন্যের জিনিস তাঁকে সে দেবে কেন? কি জিনিস কেটি বলতে পারল না।

অরিজিৎ কথাগুলো দ্রুত সংক্ষেপে নোট করছিলেন ফোন করতে করতে। বললেন—ওকে। এনি মোর?

—নাথিং স্যার! তবে কেটিকে বলেছি ব্যাপারটা যেন জেনে নেয় কৌশলে।

—ভেরি গুড! ওয়েলকাম মিঃ মজুমদার। ছাড়ি?

—থ্যাংক ইউ স্যার!···

অরিজিৎ ফোন রেখে নোটগুলো মন দিয়ে পড়লেন। তারপর হাই তুলে সিগারেট ধরালেন। রাত ন'টা বাজে। বালিগঞ্জ প্লেসের অটোমোবাইল ক্লাবে এক বন্ধুর সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে। তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু কার কি জিনিস হঠাৎ এতদিন পরে জরুরি মনে হল অমর্ত্যের যে তার জন্য জেভিয়ারের সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে গেলেন? অমর্ত্যকে যতটা 'ক্লিন ম্যান' মনে হয়েছিল, ততটা নন যেন। অবশ্য এই মার্ডার কেসের সঙ্গে এ সব ঘটনার সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। তবু ব্যাপারটা তলিয়ে জানা দরকার। কেঁচো খুঁড়তে অনেক সময় সাপ বেরিয়ে পড়ে।

হাত বাড়িয়ে স্বপন সংক্রান্ত রিপোর্টের ফাইল টানতে গিয়ে নিবৃত্ত হলেন। ব্যর্থতার ক্ষোভ! একটা পুঁচকে মস্তানকে এখনও পাকড়াও

করা যাচ্ছে না। রোজই কাগজে ব্যঙ্গাত্মক উল্লেখ থাকছে। তার ওপর চণ্ডী লাহিড়ীর কার্টুন। লাহিড়ী লাহিড়ীকে চিমটি কাটছে। ওঃ! বারেন্দ্র বামুনরা তো এমন হয় না। এ যে বিভীষণী কীর্তি।

অমর্ত্য আস্তে-সুস্থে লাইট ডিনার খেয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন ফুল-বাগিচার কাছে। তারপর চমকে উঠলেন। স্টেডিয়ামের দিকটায় খানিকটা হলুদ আলো তেরচা হয়ে পড়েছে। সেই আলোয় আবছা কালো একটা মূর্তি নাচছে। তারপর বুঝলেন, নাচছে না। বল নিয়ে খেলছে।

এত রাতে ভূতের মতো কার প্র্যাকটিশের নেশা চড়ল মাথায়? আজ ছিল বিশ্রামের দিন। তা ছাড়া কোনো খেলোয়াড়ের এত রাত অব্দি মাঠে থাকা বারণ। থাকেও না কেউ। সাতটার মধ্যে যে-যার বাড়ি চলে যায়।

অমর্ত্যর শরীরে কয়েকটা শিরা ফুটে উঠল। চোয়াল আঁটো হয়ে গেল। তারপর হনহন করে এগিয়ে গেলেন। খেলোয়াড় তাঁকে দেখেই থমকে দাঁড়াল। আবছা আলোয় তার দাঁত সাদা দেখাল। হাসছে।

অমর্ত্য গর্জন করলেন—ইউ ব্লাডি বাস্টার্ড!

প্রদীপ ফুঁসে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। আঃ! কি বলছেন অমর্ত্যদা! প্লিজ ওয়াচ হোয়াট ইউ আটার!

—আর একটা কথা বললে দাঁতগুলো খুলে নেব। গেট আউট!

প্রদীপ বলটা তুলে নিয়ে বলল—আপনাকে শ্রদ্ধা করি বলেই—

—আই সে গেট আউট! অমর্ত্য চিৎকার করে বললেন।

প্রদীপ আস্তে আস্তে টেন্টের দিকে এগোল। তার ক্ষোভ এবার ক্রোধে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সে হঠকারী স্বভাবের ছেলে নয়। অমর্ত্য রায়ের কিছু ক্ষমতা থাকতে পারে, কিন্তু তারও পৈতৃক ক্ষমতা কিছু কম নয়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, নালিশ করতে হলে তাকে ভেতরের কথাটা খুলে বলতে হয়। সেটা বলা যাবে না। পুলিসের দালাল সাব্যস্ত হবে সে এবং তাকে সবাই এড়িয়ে চলতে চাইবে।



॥ আট ॥

কর্নেল অস্থির হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন অরিজিৎ লাহিড়ীর। ছাদ থেকে নেমে এসে ফোন ধরেছিলেন। তারপর আর ছাদে ফেরেননি। তাহলে অমর্ত্যেরও একই পরিণতি ঘটল! মডুস অপারেণ্ডি—খুনের পদ্ধতি আগের মতোই। কোনো নির্জন জায়গায় আচমকা মাথার পেছনে ভোঁতা শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত। অমর্ত্যের বেলায় ছুবার আঘাত করতে হয়েছে খুনীকে। অমর্ত্য ছিলেন বলবান লোক। তাই খুনী নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিল। তিনটি ক্ষেত্রেই খুনী এমন কিছু ফেলে যায়নি, যাতে ডগস্কোয়াডের সাহায্য নেওয়া যায়।

এদিকে রাখী ও সীমন্ত গতকাল যা বলে গেছে, তাতে এও স্বপনের কাজ বলে নিশ্চয়তঃ এসে যাচ্ছে। স্বপন সীমন্তকে অমর্ত্যের ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলে গিয়েছিল। নাঃ, ছুইয়ে ছুইয়ে চারের মতো নির্ভুল গাণিতিক সত্য, এ কীর্তিও স্বপনের। অথচ কোথায় যেন একটা অসঙ্গতি থেকে যাচ্ছে। সেটা তার পিতৃহত্যার ব্যাপারটাই কি?

স্বপনের মতো দুর্দান্ত ক্রিমিন্যালের পক্ষে পিতৃহত্যা হয়তো সম্ভবও।

কর্নেল চোখ বন্ধ করে তাঁর নির্বাচিত খুনীর দিকে তাকালেন। অন্ধকারে একটা অস্পষ্ট আদল থেকে বারবার স্বপনের চেহারা ভেসে উঠছে। মিলিয়ে যাচ্ছে। ভেসে উঠছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে। অথচ হাতের মার্ডার উইপনটা একই থাকছে। সেটার দিকে মনের চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টে তাকালেন এবার। তাকিয়ে রইলেন একই তীক্ষ্ণ অভিনিবেশে। তারপর চমকে উঠলেন। হাতের অস্ত্রটা হঠাৎ মুহূর্তের জন্য স্পষ্ট হয়েই মিলিয়ে গেল। আশ্চর্য, সেটা একটা হাতুড়ি!

চোখ খুলে কর্নেল টের পেলেন, তাঁর উরু দুটো ভারি হয়ে উঠেছে। আস্তে আস্তে সোফায় বসে পড়লেন।

হাতুড়ি! কেন একথাটা তাঁর মাথায় আসেনি এতদিন? হাতুড়ি ছাড়া আর কি হতে পারে? আগের দুটো ডেড-বডির মাথার পেছনে এক বর্গ ইঞ্চি গভীর ক্ষতচিহ্ন ছিল। অমর্ত্যের পোস্টমর্টেম এখনও হয়নি। কিন্তু আপাতদৃষ্টে তার মাথার পেছন দিকে দুটো একই পরিমাণ ক্ষতচিহ্ন দেখা গেছে। স্টেডিয়ামের দুদিকের সারবদ্ধ আসনের ফাঁকে মাঠের সমতলে যে প্যাসেজ, তা বড় জোর দেড় গজের বেশী চওড়া হতে পারে না। এমন সংকীর্ণ জায়গায় মোক্ষম আঘাত হানতে হলে হাতুড়ী খুব কাজের জিনিস।

স্বপন ক্রিমিন্যাল। ড্যাগার বা পিস্তল তার স্বাভাবিক অস্ত্র। সে কেন হাতুড়ি ব্যবহার করছে? তা ছাড়া হাতুড়ি মেরে হত্যা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে হলে তাকে হাতুড়ির ব্যবহারও শিখতে হয়েছে। সে ছিল ফুটবলার। তারপর ড্যাগার পিস্তল চালিয়েছে। বোম মেরেছে। হাতুড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকতে পারে না। থাকতে পারে—হুঁ, তপনের।

তার ভাই তপন কারখানায় কাজ করে। হাতুড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। হয়তো আছে। কিন্তু তপনের সঙ্গে এই কেসের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ধরা পড়েনি। পুলিস রেকর্ডে তার নাম নেই। এই কেসের তদন্তে কোনো সূত্রেই সে জড়িত হয়নি।

নাকি কোনো সূত্র আছে, যা এখনও চোখে পড়েনি। যে-সূত্র তপনের দিকে নিয়ে যাবে, সেই সূত্র কি এখনও অনাবিষ্কৃত?

কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, তপনের চরিত্র সম্পর্কে যতটুকু তথ্য কর্নেলের হাতে আছে, তাতে তাঁর আইডিয়া খুনীর সঙ্গে আদপে কোনো মিল নেই। নরকতত্ত্ব নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারে একজন পরিণতবয়স্ক মানুষ।

স্বপনের সঙ্গে যেমন তপনের সঙ্গেও এই ব্যাপারটাতে গণ্ডগোল বাধছে। দুজনেই তরুণ। অপরিণত মন দুজনেরই।

আবার চমকে গেলেন নিজের চিন্তার গতিপথ লক্ষ্য করে। একজন পরিণতবয়স্ক মানুষ! অমিয় বক্সীর লাশ চিমনীর মধ্যে ঢুকিয়ে সে নিজের ধ্যানধারণার পরিষ্কার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছিল।

কর্নেল আবার উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। সোজা হয়ে বসলেন।

কলিং বেল বাজল। ষষ্ঠীর পায়ের শব্দ হল বাইরের ঘরে। দরজা খোলার শব্দ হল। তারপর অরিজিৎ লাহিড়ী প্রবেশ করলেন গম্ভীর মুখে। কর্নেল বললেন, বস।

অরিজিৎ সিগারেট ধরালেন। তারপর আস্তে বললেন—এবারেও একই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। অমর্ত্য রায় রাত্রে কেন স্টেডিয়ামের ভেতর ঢুকেছিলেন! আর—

কর্নেল তাকালেন তাঁর দিকে।

—আর স্টেডিয়ামের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে তারের বেড়ার ওধারে ব্যায়ামাগার। সামনে একটা সুইমিং পুল আছে। সেখানে একটা বল ভাসছিল।

—ভাসতেই পারে। প্লেয়াররা বলটা আলসেমি করে তোলেনি।

—না। বলটা বাইরের। অর্থাৎ ক্লাব যে বিশেষ কোম্পানির বল ব্যবহার করে, সেই বল নয়। জাস্ট বাজে ধরনের ফুটবল।

—বাইরে তো ময়দান। অসংখ্য ছেলে খেলা করে। কিক খেয়ে ভেতরে এসে পড়েছিল।

—তাও নয়, কর্নেল। অরিজিৎ মাথা নাড়লেন।—স্টেডিয়ামের পূর্বে, দক্ষিণে রাস্তা। পশ্চিমে টেনিস ক্লাব। উত্তরে অবশ্য মাঠ আছে। অন্যান্য ক্লাবের টেণ্ট আছে। কিন্তু সেখান থেকে বল এলে কোনো সুপারম্যানের কিক দরকার। এখন প্রদীপ—মানে রাইট ব্যাক প্রদীপ মৈত্রের কথা বলেছিলুম আপনাকে। তাকে অমর্ত্যবাবুকে গার্ড দিতে বলেছিলুম, মনে আছে কি?

—নিশ্চয় আছে।

—অমর্ত্যবাবু প্রদীপের অতি উৎসাহী হাবভাবে একটা কিছু আঁচ করে তাকে খুব থ্রেটন করেছিলেন গতকাল। ছেলেটা একটু বোকাও। কাল

রাত ন'টা অব্দি সে স্টেডিয়ামের ভেতর বল প্র্যাকটিশ করছিল। বাড়ি ফেরার ইচ্ছে ছিল না। ওই যে বলা হয়েছে, তাকে অমর্ত্যবাবুর বডি-গার্ড হতে হবে. অথচ উনি যেন টের না পান।

—বুঝলুম। তারপর?

—অমর্ত্যবাবু তাকে অশ্লীল গাল দিয়ে প্রায় মারতে বাকি রাখেন। রাগ করে প্রদীপ চলে যায়। অমর্ত্যবাবু স্টেডিয়াম থেকে ফিরে টেণ্টে ঢোকেন। পরিমল বলেছে, নিজের ঘরে শুয়ে পড়েন তারপর।

কর্নেল তাকালেন অরিজিতের দিকে।—তাহলে আবার স্টেডিয়ামে গিয়েছিলেন?

—তাই তো দেখা যাচ্ছে!

—বাইরের একটা বল সুইমিং পুলে ভাসছিল?

—হ্যাঁ।

—অরিজিৎ! মার্ডারার অতি ধূর্ত একজন পরিণতবয়স্ক মানুষ। সে কাল ক্লাব এরিয়ার ভেতর ছিল। প্রদীপের ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে সে। তারপর মোডুস অপারেণ্ডি তৈরি করে নিয়েছে। প্রদীপ অত রাতে স্টেডিয়ামের ভেতর বল প্র্যাকটিশ করছিল তো?

অরিজিৎ তাকিয়েছিলেন। বললেন, মাই গুডনেস। বুঝতে পেরেছি।

—খুনি দিনেও কাছাকাছি ছিল। প্রদীপ নিশ্চয় সারা বিকেল থেকে রাত্রি পর্যন্ত স্টেডিয়ামে বল প্র্যাকটিশ করছিল। অমর্ত্য তাকে থ্রেটন করেছেন। সেই দেখে তার মাথায় এসেছে—

—কর্নেল! কাল ছিল ক্লাবের বিশ্রামদিবস।

—তবু প্রদীপ একা বল প্র্যাকটিশ করছিল। অমর্ত্য রাগ করতেই পারেন। খুনী ব্যাপারটা আঁচ করে একটা ফুটবল সংগ্রহ করে এনেছিল। প্রদীপ চলে যাওয়ার পর সে ফুটবলটা নিয়ে স্টেডিয়ামের ভেতর খেলার ভাণ করে। অমর্ত্য তেড়ে আসবেন সে জানে। সে ফাঁদ পেতে রেখেছিল, ডার্লিং! অমর্ত্য সেই ফাঁদে ধরা দিয়েছেন।

অরিজিৎ একটু ভেবে বললেন—কিন্তু বাইরের লোক ক্লাব এরিয়ার ভিতর থাকলে কারুর না কারুর চোখে পড়ত।

—পড়েনি, এর কারণ হতে পারে, সে ক্লাবেরই লোক।

অরিজিৎ উদ্বিগ্নভাবে থেকেও একটু হাসলেন।—কাল ছিল রেস্ট ডে।

প্রদীপ ছাড়া কোনো প্লেয়ার আসেনি। বেলা দুটোয় লাঞ্চ-মিটিং ছিল কর্মকর্তাদের। তেরজন উপস্থিত ছিলেন।

—আনলাকি থার্টিন! হুঁ—বল।

—অমর্ত্য বাদে বাকি বারোজনও গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনটে নাগাদ তাঁরা চলে যান। থেকে যান শুধু বালক দাশগুপ্ত। ফিল্ম ডিরেক্টার। তিনি ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা! টেন্ট মেরামতের প্রস্তাব নেওয়া হয়। বরাবর তিনিই এই দায়িত্ব নেন। সরল সেন নামে এক সিনেমা লাইনের কন্ট্রাক্টারকে দিয়ে এ সব কাজ করিয়ে নেন কম খরচে।

—ভেরি ইণ্টারেস্টিং!

—সরলবাবুকে বালকবাবু ফোন করে আসতে বলে অপেক্ষা করছিলেন। কাজটা বুঝিয়ে দেবেন এবং এস্টিমেট চাইবেন বলে।

—এসেছিলেন সরলবাবু?

—হ্যাঁ। সাড়ে তিনটেয়, সঙ্গে ইলেকট্রিসিয়ান এবং কাঠের মিস্তিরি নিয়ে তিনি আসেন। তাঁরা সবাই মিলে ফিতে ধরে মাপজোক করেন। সন্ধ্যা সাড়ে ছটা পর্যন্ত ছিলেন তাঁরা, কিংবা আরও একটু বেশী।

কর্নেল চোখ বুজে শুনছিলেন। চোখ খুলে বললেন—ইলেকট্রিসিয়ান এবং কাঠের মিস্তিরি?

অরিজিৎ কান না করে বললেন—এদিকে অমর্ত্য বেরিয়ে যান চারটের কাছাকাছি—একটু পরে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে গিয়ে এক কাণ্ড করেন তিনি ....

অরিজিৎ জেভিয়ার বুড়োর সঙ্গে অমর্ত্যের ঝগড়া ইত্যাদির পুরো বিবরণ দিয়ে বললেন—কাজেই বুঝতে পারছেন, বাইরের লোক বলতে—

কথা কেড়ে কর্নেল দ্রুত বললেন—হুঁ, ইলেকট্রিশিয়ান এবং কাঠের মিস্তিরি!

—তারা কন্ট্রাক্টারের লোক। তাঁর সঙ্গেই চলে গিয়েছিল।

—অরিজিৎ, ওই দুজনকে এক্ষুণি আটক কর। জেবার সময় আমি উপস্থিত থাকতে চাই।

অরিজিৎ অবাক হয়ে বললেন—কেন, কি ব্যাপার?

কর্নেল অধীর হয়ে বললেন—এক মুহূর্ত দেরি নয়। যা বলছি, কর। এতদিনে এই কেসের সঠিক সূত্রের নাগাল পেয়েছি, অরিজিৎ! হাঁ করে কি দেখছ? নির্দেশ দাও তোমার লোকেদের। ওঠ!

অরিজিৎ পুতুলের মতো উঠে ফোনের কাছে গেলেন। ডায়াল করে সাড়া পেয়ে চাপা গলায় কথা বললেন। তারপর ফিরে এসে তেমনি অবাক মুখে বসে পড়লেন।

কর্নেল বললেন—একটা হাতুড়ি, অরিজিৎ! আমি এত বোকা হয়ে গেছি—কিংবা আমার চিন্তাশক্তি পোকামাকড় গাছপালার সাহচর্যে মানুষের স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা হারিয়ে ফেলেছে, তাই মূল ব্যাপারটাতে দৃষ্টি রাখিনি। ডার্লিং! মার্ডার উইপনের কথা বলছি, যা দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। মার্ডার উইপন মার্ডারারের মানসিক প্রবণতার প্রতীক নয় কি? প্রত্যেকটি হত্যাকাণ্ডে হত্যার জন্য কি অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে, এটা জরুরি। হত্যাকারীকে বুঝতে সাহায্য করে। একটা হাতুড়ি আমাকে অনেক কথা বলে দিচ্ছে এক্ষেত্রে।

অরিজিৎ একটু হাসলেন।—ওকে, আই এগ্রি। তবে আপনি গোড়ায় আমাকে বলেছিলেন, যে খুন হয়েছে, তার লাইফ-হিস্ট্রি তলিয়ে দেখতে।

কর্নেল উত্তেজিতভাবে বললেন—তুটোই। মার্ডার উইপন এবং নিহতের লাইফ-হিস্ট্রি—তুটোই দেখছি এই কেসে জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোড়ায় আমি একটু ভুল পথে চলে গিয়েছিলুম। কতকগুলো তথ্য আমাকে মিসলিড করেছিল। কিন্তু একটা হাতুড়ি আমাকে সঠিক পথে পৌঁছে দিল এতদিনে।

অরিজিৎ বললেন—হাতুড়িজাতীয় মার্ডার উইপনের কথা আমরাও ভেবেছি। ফরেন্সিক এবং মর্গের রিপোর্ট তুইয়েতেই মার্ডার উইপন সাজেস্ট করা হয়েছে হাতুড়ি।

—হাতুড়ি সবাই ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু একটিমাত্র আঘাতে মৃত্যু নিশ্চিত করতে হলে হাতুড়িতে অভ্যস্ত হওয়া দরকার নয় কি? ভেবে দেখ, একজন ইলেকট্রিশিয়ান যেমন, তেমনি একজন কাঠের মিস্ত্রী, তুজনেই হাতুড়ি চালনায় দক্ষ। এদেরই একজন হত্যাকারী, অরিজিৎ। আরও দেখ, এরা সিনেমা স্টুডিওর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। স্টুডিওর কাজও করে।

অরিজিৎ তর্কের ভঙ্গিতে বললেন—কিন্তু মোটিফ? স্বপনের মোটিফ যেখানে রীতিমতো এস্টাব্লিশড! একজন সিনেমা কণ্ট্রাক্টারের তুজন সাধারণ কর্মচারীর কি মোটিফ থাকতে পারে?

—ওদের মুখে কি বেরোয়, দেখা যাক। তারপর আমি এবার পুরোপুরি নামব, ডার্লিং! কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন।—তুমি নিজে গিয়ে দেখ, ওদের

গ্রেফতার করা হল কি না। দিস ইজ ভাইটাল। কারণ আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, এখনও আরও হত্যাকাণ্ডের সম্ভাবনা আছে। তোমাকে আগে বলেছিলুম, দি কিলার অ্যাট লুজ। আবার বলছি। হয়তো আরও কিছু মানুষের জীবন এখনও বিপন্ন। এই হত্যাকারী অত্যন্ত ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের লোক। অসামান্য তার মোডুস অপারেণ্ডি—অতি দক্ষতাপূর্ণ তার হত্যা পরিকল্পনা। নিজেকে সে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে বেছে বেছে তার জানা পাপীদের শাস্তি দিতে নেমেছে। আমি কি বলছি বুঝতে পারছ? সে নিশ্চিতভাবে যাদের পাপকর্মের সাক্ষী কিংবা কোনো বিশ্বস্তসূত্রে সেই পাপের কথা জেনেছে, তাদেরই একে একে শাস্তি দিচ্ছে। তার ধারণা, এই পাপীদের নরকে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেই অশান্ত চিত্তের শান্তি; প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার তৃপ্তি।

অরিজিৎ গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়ালেন।—ওকে। ওয়েট অ্যাণ্ড সি। বলে বেরিয়ে গেলেন দ্রুত।...

কর্নেল দুপুরে খেতে বসেছেন, তখন ষষ্ঠী ঘোষণা করল লালবাজারের নাহিড়ী সায়েবের 'ফোং'।

—অরিজিৎ, বল!

—কাঠের মিস্তিরিকে অ্যারেস্ট করে আনা হয়েছিল। নাম হোসেন আলি। বয়স ষাটের ওধারে। হাঁপানি-রোগী। তার অবস্থা দেখে তক্ষুণি হসপিটালে নিয়ে যেতে হয়েছে।

—ইলেকট্রিশিয়ান?

—তার বয়সও নাকি ওইরকম। নাম বনবিহারী দাস। কাল ক্লাব থেকে বেরিয়ে সোজা হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে চেপে দেশে গেছে—মেদিনীপুর গ্রামে। ছেলের অসুখের খবর এসেছিল সকালে। আগেই ছুটি চেয়ে রেখেছিল। গ্রামের ঠিকানা নিয়ে সেখানকার থানায় মেসেজ পাঠানো হয়েছে।

অরিজিতের কথার মধ্যে হাসির—বিদ্রূপাত্মক হাসির ঝাঁঝ ছিল।—ঠিক আছে। বলে ফোন রেখে কর্নেল ডাইনিং রুমে ফিরে গেলেন। হুঁ, ক্লাব থেকে বেরিয়েই বনবিহারী নাকি হাওড়া স্টেশন চলে যায়। অরিজিৎ পয়েন্টটা বোঝেনি।

ষষ্ঠী বলল—বাবামশাই, রান্না কি ভাল হয়নি আজ?

কর্নেল হাসবার চেষ্টা করলেন।—না রে! শরীরটা কেমন করছে। না না—তেমন কিছু নয়! অমন করে না তাকিয়ে বসে পড়. একটু রেস্ট নিয়ে আমি বেরুব। আর শোন্, বিকেলে কেউ এলে একটু অপেক্ষা করতে, বলিস। কারুর ফোন এলে জেনে রাখিস কোনো জরুরি কথা আছে নাকি?

তিনটেয় বেরিয়ে পড়লেন লাল ল্যাণ্ডরোভার নিয়ে। ফ্রি স্কুল স্ট্রিট এখান থেকে মিনিট পনেরর রাস্তা। কিন্তু ইচ্ছে করেই গাড়ি নিলেন : গাড়িওয়ালা না হলে ও সব মহলে পাত্তা পাওয়া কঠিন।

পকেটে রোজি স্মিথের ঠিকানা লেখা ছিল। অরিজিৎ বলছিল, বাড়িটার মালিক মিসেস মিশেল। জেভিয়ার নামে রিটায়ার্ড রেলকর্মী তার সঙ্গে থাকে। জেভিয়ারই নাকি কণ্টাক্টম্যান! তার হাতে অনেক মস্তান আছে।

বাড়িটা দোতলা। জরাজীর্ণ অবস্থা। গেট আছে: গেটের পর বারান্দায় ওঠার সিঁড়ি। দুধারে বুগানভিলিয়া লাল হয়ে আছে। গেটের সামনে যেতেই তাঁর বয়সী—কিন্তু রোগা হাড়জিরজিরে এক অ্যাংলো-সায়েব চোখে বিস্ময় ও সন্দেহ নিয়ে সিঁড়িতে আবির্ভূত হল। ট্যাঁস ইংরেজিতে বলল—কাকে চাই আপনার?

কর্নেল ভেতরে গিয়ে বললেন—রোজি স্মিথকে।

—তাই বলুন। বলে সে কেমন হেসে নেমে এল। ওপরে দোতলার দিকে মুখ তুলে হাতছানি দিয়ে ডাকল—রোজি! রোজি!

জানলায় লালচে চুল, ফর্সা, লম্বাটে একটা মুখ পর্দা তুলে বলল—কি হয়েছে খুড়ো (আঙ্কল)?

—এই ভদ্রলোক তোমাকে খুঁজছেন!

রোজি জোরালো চোখে কর্নেলের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল—আমি এখন ব্যস্ত।

বারান্দা থেকে শ্যামবর্ণ প্রকাণ্ড মোটা এবং গাউনপরা এক বৃদ্ধা কুৎসিত খিস্তি করল রোজির নামে চাপা গলায়। তারপর জেভিয়ার সায়েবের উদ্দেশে বলল—ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস কর, আর কাউকে চাই নাকি। কেটি এখন খালি আছে, কেটি ইজ ফ্রি নাও।

জেভিয়ারের চোখ থেকে সেই সন্দিগ্ধ ভাবটা ঘুচে গেছে। চোখে হাসি টলটল করছে। দাড়িওয়ালা তার বয়সী এক হুমদো বুড়ো—তাদের মতোই ইংরেজি বলছে এবং পাক্কা ইউরোপীয়ের মতো ভাবভঙ্গি। নিশ্চয় বিদেশী—

ইংলিশম্যান না হোক। সে মুচকি হেসে বলল—নিশ্চয় কলকাতার বাইরে থেকে?

—হ্যাঁ। বোম্বে।

—কলকাতার লোক দেখলেই চেনা যায়। ইউ আর ওয়েলকাম জেণ্টলম্যান!

বুড়ি গর্জন করল অশ্লীল ভাষায়।—কেটিকে ডাকছ না কেন? ড্যাম ফুল! ক্রিয়েটিং সিন এগেন। হেই ম্যান, ইউ কাম হেয়ার। কেটি! কেটি?

বুড়ির চিৎকার শুনে কানে তালা ধরে গেল। কিন্তু কেটি নেমে এল। পরনে হাতকাটা ম্যাক্সি। রোগা, নাক বেরিয়ে থাকা একটা মেয়ে। বয়স অনুমান করা কঠিন। কর্নেল বারান্দায় উঠে গেলেন। কেটি নির্বিকার দৃষ্টে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি কি পাদ্রী নাকি?

কর্নেল হাসলেন।—কক্ষণো না। আমি ব্যবসায়ী। বোম্বেওয়ালা।

—একশো টাকা।

—উহুঁ পঁচিশ।

—পঞ্চাশ। শেষ কথা।

জেভিয়ার মধ্যস্থতা করল।—ওকে। তিরিশ দাও। ঝামেলা কর না।

কেটি বলল—তাহলে পঁয়ত্রিশ।

সে হাত বাড়াল। কর্নেলের মনের ভেতর অট্টহাসি প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। জীবনে এমন অভিজ্ঞতা আর কখনও হয়নি। কিন্তু যত কদর্য হোক, এই পদ্ধতি ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। টাকা দিয়ে কেটিকে অনুসরণ করলেন। ঘোরালো অন্ধকার সিঁড়ি। খদ্দেরের খাতিরে কেটি সুইচ টিপে আলো জ্বালল। মিটমিটে আলো। ওপরে গিয়ে কেটি একবার ঘুরে লাস্যের ভঙ্গিতে হাসল।—এস হে বুড়ো প্রেমিক (কাম অন মাই ওল্ড লাভার)!

পাশের দরজায় উঁকি মেরে রোজি একবার দেখেই শব্দ করে দরজা বন্ধ করল। কর্নেল সেদিকে তাকিয়ে আছেন দেখে কেটি বাঁকা হেসে বলল—রোজিকে পঁয়ত্রিশে পাচ্ছ না ম্যান! তার দাম অনেক। পাশে দুটো জিরো যোগ কর।

কর্নেল ভেতরে ঢুকলেন। চারদিকের দেয়ালে অশ্লীল ছবি। টেবিলে

বিদেশী সেক্সপত্রিকা। একটা জীর্ণ খাটের ওপর ছোবড়ার গদি। সস্তা ধরনের বেডকভার চাপানো। কেমন একটা কড়া গন্ধ ঘরের ভেতর। গাঁজা কিংবা ওই জাতীয় কিছু। একপাশে যেমন তেমন সোফাসেট। একটা ছোট্ট কাঠের আলমারি। একটা ড্রেসিং টেবিল। টিফিন কেরিয়ার। একটা ছোট আলনায় কিছু পোশাক ঝুলছে। হয়তো আসবাবগুলো ভাড়া করা। মাথার ওপর নড়বড়ে ফ্যানটাও। চন্দ্রারও এই জীবন ছিল!

কেটি দরজা এঁটে কপাটে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল।—ড্রিংক চাই না?

—না। ধন্যবাদ।

—আমার যে চাই। টাকা দাও!

কর্নেল হাসলেন। তারপর আরও একটা দশটাকার নোট বের করে দিলেন। কেটি সব টাকা দেয়ালে ঝোলানো হ্যাণ্ডব্যাগে রেখে কাঠের আলমারি খুলে একটা হুইস্কির বোতল বের করল। গ্লাসে ঢেলে খাটের তলা থেকে কুঁজোর জল মেশাল। চুমুক দিয়ে খাটে বসল। কর্নেল তখনও দাঁড়িয়ে। ভাবছেন হতভাগিনী চন্দ্রা এমনি একটা ঘরে থাকত। এই পরিবেশে মারা গেছে। হুঁ কেটি রঙীন জল খাচ্ছে। কর্নেল সোফায় বসে বললেন—কেটি, এখানে এস।

কেটি বলল—নাও গেট আনড্রেস ম্যান!

—আমি বুড়ো মানুষ, ডার্লিং! শুকনো মরুভূমি!

—তাহলে আমার দিকে তাকাও। আমি তোমাকে সাহায্য করব।

কেটি ম্যাক্সির চেন টানতে গেলে কর্নেল দ্রুত বললেন—কেটি! আমি সেক্সের জন্য আসিনি।

কেটি ভুরু কুঁচকে তাকাল।—তাহলে কেন এসেছ?

—আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। শুধু কথা।

—কথা! কেটি খুব অবাক হয়ে গেল!—মাই গুডনেস! কে তুমি?

—বোম্বের ব্যবসায়ী। কর্নেল হাসলেন।—আমার এই বাতিক, কেটি। কথা বললেই আমি আনন্দ পাই। তুমি কথা বল আমার সঙ্গে। জাস্ট কথা! বল, কথা বল!

কেটি খিলখিল করে হেসে উঠল।—ইউ ওল্ড পার্ভার্ট! আমি জানি—দেখেছি। বুড়োরা কেউ কেউ এসে অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার করে। কিন্তু শুধু কথা বললে কেউ সেক্সের আনন্দ পাচ্ছে, তা দেখিনি। ওকে। বল, কি

কথা বলব? কিন্তু মনে রেখো, ইতিমধ্যে দশ মিনিট হয়ে গেছে। আর কুড়ি মিনিট বাকি।

—চার মিনিট ও হয়নি, ডার্লিং!

—তর্ক কোরো না। আমি ঠিক বলেছি। হুঁ, বল কি কথা বলব?

—চন্দ্রার কথা।

কেটি চমকে উঠল। তার চোখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। সে গেলাস রেখে আস্তে বলল—তাহলে তুমি পুলিসের লোক? কাল পুলিস এসে খুব ঝামেলা করে গেছে। আবার আজ—তুমি ডিটেকটিভ?

—চন্দ্রার কথা বলার সঙ্গে পুলিসের কি সম্পর্ক, কেটি? কর্নেল শান্তভাবে হেসে চুরুট ধরালেন।—গতবছর আমি কলকাতা এসে চন্দ্রার সঙ্গে আলাপ করে গেছি। তখন আমার দাড়ি ছিল না। তাই তোমার মনে নেই। আমি এসেছিলুম ফুটবল কোচ অমর্ত্য রায়ের সঙ্গে। চন্দ্রা তখন অসুস্থ ছিল। পরে অমর্ত্য রায় আমাকে বলেছিল, চন্দ্রা মারা গেছে। এ লাভলি গার্ল! খুব মায়া হয়েছিল ওকে দেখে।

কেটি চোখ বড় করে শুনছিল। দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলল—সত্যি তুমি পুলিসের লোক নও? দেখ, চালাকি কর না। পুলিসের সঙ্গে আমার খাতির আছে।

কর্নেল কান না করে বললেন—চন্দ্রার মৃত্যুর কথা শুনে খুব মন খারাপ হয়ে গেছে। তাই ওর কথা শুনতে চাইছি। রোজি ওকে পছন্দ করত না। কিন্তু রোজি ওর অনেক কথা জানে। তাই প্রথমে এসে রোজিকে খুঁজছিলুম।

কেটি ঠোঁট উল্টে বলল—রোজি একটা ডাইনি।

রোজির কথা কর্নেল আন্দাজে বলেছিলেন। দেখলেন, হিসেবে ভুল হয়নি। রোজির যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী এই ব্রথেলে চন্দ্রাই ছিল। কাজেই রোজির তাকে পছন্দ করার কথা নয়। একটু হেসে বললেন—স্বপন নামে একটা ছেলের সঙ্গে চন্দ্রার গোপন সম্পর্ক ছিল। স্বপন ওকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাইত। তাই নিয়ে অমর্ত্য রায়ের সঙ্গে তার ঝগড়া।

—তুমি তো দেখছি অনেক কিছু জান! কে তুমি?

—জানি, অমর্ত্য আমার বন্ধু যে!

—তার বয়স তোমার চেয়ে কম !

—তাতে কি ? কর্নেল হো হো করে হাসলেন—আমি দাড়ি কেটে ফেললে যতটা বুড়ো ভাবছ, এতটা দেখাবে না। হুঁ, যা বলছিলুম। স্বপনকে আমি অবশ্য দেখিনি। তুমি নিশ্চয় দেখেছ।

কেটি শক্ত মুখে বলল—স্বপন মার্ডারার। তার ছবি বেরিয়েছিল কাগজে। আমি দেখেছি। পুলিস ফ্রেণ্ড আছে আমার। সে বলেছে। স্বপন কাকে খুন করে ফেরারি হয়েছে। তুমি তার ব্যাপারে এসে থাকলে ভুল করবে স্বপন চন্দ্রার মৃত্যুর পর আর এখানে আসেনি।

—স্বপন নয়, চন্দ্রার কথাই জানতে চাইছি, ডার্লিং !

—চন্দ্রা বাঙালী হিন্দু মেয়ে ছিল। মিসেস মিশেল ওকে পিক আপ করে এনেছিল কোথা থেকে।

—অমর্ত্যের কাছে শুনেছি, রাখী নামে ওর এক বন্ধু ছিল। সে এখানে আসত মাঝে মাঝে।

—রাখী ? ও নামে কেউ এখানে আসত না। নিশ্চয় করে বলতে পারি তোমাকে।

—তাহলে বাইরে-বাইরে মিশত ওরা। তুমি কি জানো রাখী স্বপনের বোন ?

—আমার জানার কোনো দরকার নেই। বন্ধ কর এ সব কথাবার্তা আমার ভাল লাগছে না।

—চন্দ্রা কেন স্বপনের সঙ্গে চলে যায়নি, এটা ভাবতে অবাক লাগে।

কেটি ঠোঁট বাঁকা করে বলল—গিয়ে মরবে ? এখন কি অবস্থা হত বেঁচে থাকলে চন্দ্রা ? ওর বাবা এসে কতবার সাধাসাধি করত, পুলিসের নাম করে ভয় দেখাত, তাই যায়নি, তো কোথাকার কে স্বপন !

—ওর বাবা ছিল নাকি ?

কেটি হেসে উঠল।—ম্যান ! বাবা ছাড়া কেউ জন্মায় নাকি ? বোকা মতো কথা বল না।

—কেটি ! তোমার ড্রিঙ্ক শেষ। আবার ড্রিঙ্ক নাও। বলে কর্নেল আবার একটা দশ টাকার নোট দিলেন।

কেটি ঝটপট টাকাটা নিয়ে সেই হ্যাণ্ডব্যাগে ঢুকিয়ে আলমারি খুলল কর্নেল দেখলেন অন্য একটা বোতল থেকে হুইস্কি ঢালছে। সত্যিকা

হুইস্কি বলে মনে হল। জল মিশিয়ে একটু গিলে সে হাসল—থ্যাঙ্ক ইউ, ম্যান!

—তাহলে চন্দ্রার বাবা এখানে আসত?

—না। ওই গেটে দাঁড়িয়ে ডাকত! মিসেস মিশেল ঢুকতে দিলে তো? একটা বাজে লোক, এ ম্যান ফ্রম দা স্ট্রিট। মিঃ জেভিয়ারের চাইতে রোগা; নোংরা পোশাক। জাস্ট এ ওয়ার্কম্যান! কলকারখানায় যারা কাজ করে, তাদের মতো।

কর্নেল উত্তেজনা চেপে বললেন—পুলিস দিয়ে মেয়েকে নিয়ে যেতে চাইত?

—বোকার মতো কথা বল না! পুলিসের কর্তারা মিসেস মিশেলের ঘনিষ্ঠ লোক। মানে, মাসে মাসে প্রচুর টাকা দেয়; দাগী ক্রিমিন্যাল এসে পড়লে খবর দেয়। তা ছাড়া মিঃ জেভিয়ারকে দেখলে—তাকে যা ভাবছ, তা নয়। ওর একটা গ্যাং আছে।···বলে কেটি পা দুটো নাচিয়ে হাসল।—পুলিসও তা জানে। তুমি পুলিস হও, বা ডিটেকটিভ হও, আমি গ্রাহ্য করি না।

—চন্দ্রার কাছে ওর বাবা-মায়ের ছবি ছিল নিশ্চয়! কর্নেল স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে কথাটা বলে হেঁট হয়ে জুতোর ফিতে ঠিকঠাক করতে থাকলেন যেন উঠে পড়বেন এবার।

কেটি বলল—ছিল। আমি দেখেছি! আমাকে দেখাত ওর ছোটবেলার ছবিও দেখেছি।

—ছবিগুলো নিশ্চয় মিঃ জেভিয়ার বা মিসেস মিশেলের কাছে আছে। বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন।

কেটি ব্যস্ত হয়ে বলল—চলে যাচ্ছ?

—এতক্ষণে আধঘণ্টা হল, ডার্লিং!

কেটি পেছন পেছন আসছিল। সিঁড়ির মুখে এসে বলল—আবার এস। ডিটেকটিভ হও, আর যেই হও—আমি···একটা অশ্লীল কথা বলে সে হাসতে লাগল। শুধু কথা বলেই আজ কতগুলো টাকা পেয়েছে।

কর্নেল নিচে এসে দেখলেন, বুড়ো বুড়ি বসে আছে। তাঁকে দেখেই বুড়ো তড়াক করে উঠে ওপরে চলে গেল। কর্নেল কথা বলার সুযোগ পেলেন না। মিসেস মিশেল গম্ভীর মুখে পুরনো পত্রিকা পড়ছে। তাকালও

না। কর্নেল নেমে এলেন সিঁড়ি বেয়ে। গেট খুলে সোজা গাড়িতে উঠলেন। স্টার্ট দিয়ে আয়নায় দেখলেন, পানের দোকানের সামনে একটা লোক তাঁর গাড়ির নম্বর টুকছে। অরিজিতের লোক। যাই হোক, রোজির চেয়ে কেটিই তাঁকে খুশি করতে পেরেছে।

ট্র্যাফিক জ্যাম সারাপথ। বরানগরে পারমিতার বাড়ি খুঁজে বের করতে অন্ধকার হয়ে গেল—লোডশেডিং। বাড়িটা হাউসিং এস্টেটের। সামনে লন, কিছু গাছ, ছোট্ট পার্ক। বুগানভিলিয়ার ঝাঁপি ঠিক সিঁড়িতে ওঠার বড় দরজার মাথায়। দুদিক থেকে দুটো গাছ উঠেছে। পারমিতা চারতলার ফ্ল্যাটে থাকে। ঢুকতে গিয়েই ঘুরে দাঁড়ালেন কর্নেল। বরাবর এই ষষ্ঠেন্দ্রিয়জাত বোধ কোনো বিপদের মুহূর্তে সজাগ করে দেয়। ঘুরেই অন্ধকারে বুগানভিলিয়ার ঝোপের মতো প্রকাণ্ড গুঁড়িটার আড়ালে—বাঁদিকে একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে টর্চ জ্বাললেন। দেখলেন মাথার একপাশে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা একটা লোক। দুহাতে মুখ ঢেকে সে বলে উঠল—আলো নেভান! আমি স্বপন। রাখীর দাদা!

কর্নেলের টর্চ নিভে গেল।—এখানে কি করছ?

—মিতুদির কাছে এসেছিলুম সব কথা বলতে। শুনলুম, আপনি আসছেন। বসে থেকে থেকে দেরি দেখে চলে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ গাড়িটা এল। তার ভেতর আপনাকে দেখলুম।···স্বপন ফিসফিস করে কথা বলছিল। পা বাড়িয়ে ফের বলল—মিতুদির কাছে আপনার চেহারার ডেসক্রিপশান জেনে নিয়েছি। মুখে দাড়ি। ফর্সা সায়েবদের মতো রঙ।

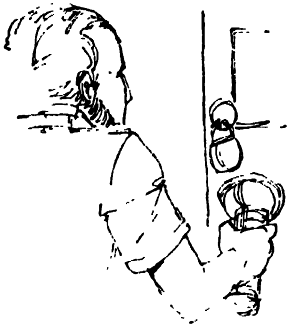
কর্নেল উত্তেজনা দমন করে বললেন—এস।

স্বপন সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বলল—বেশীক্ষণ থাকা ওর রিস্কি। প্লিজ, দেখবেন যেন।

—দেখব। তোমার মাথায় ব্যাণ্ডেজ কেন?

—এটার জন্যই রিস্ক নিয়ে দৌড়ে এসেছিলুম। উনি আপনার কথা বললেন। অমিয়বাবু, বাবা আর গতরাতে অর্মত্যদাকে যে খুন করেছে, সে এবার আমাকে খুন করতে চায়। খুব বেঁচে গেছি কাল রাতে।

কর্নেল বললেন—চুপ। মিতার ঘরে বসে সব শুনব।···



॥ নয় ॥

পারমিতা মুখ নামিয়ে আস্তে বললেন—বিশ্বাস করুন, আজ সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত স্বপনকে আমি চিনতুম না। হঠাৎ ও এসে পরিচয় দিল! জোর করে ঘরে ঢুকে নিজেই দরজা বন্ধ করে দিল।

স্বপন হাসল।—মিতুদি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। এবার বুঝি ওঁকে খুন করতে এসেছি ভেবে।

পারমিতা বললেন—তারপর ও আমার পা জড়িয়ে ধরল। আমি তো—

স্বপন বলল—এ ছাড়া উপায় ছিল না। তবে মিতুদি আমাকে ভুলে গেছেন। আমার বোন রাখীকে ওঁদের কলেজে ভর্তি করানোর জন্য একবার আমি ওঁর কাছে এসেছিলুম—বাবার পরামর্শে। রাখীর নম্বর খুব কম ছিল।

পারমিতা মুখ তুলে বললেন—স্বপন কথাটা মনে পড়িয়ে না দিলে মনে পড়ত না। রাখীর জন্য চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু আর কেউ আসেনি আমার কাছে—না স্বপন, না রাখী।

স্বপন গলার ভেতর থেকে বলল—তখন রাখী গোল্লায় যেতে বসেছে বাবা-মায়ের প্রশ্রয় পেয়ে। রাগ করে আর আসিনি।

কর্নেল চুরুট কামড়ে লক্ষ্য করছিলেন স্বপনকে। দাড়ি রেখেছে স্বপন। চোখ দুটো কোটর-গত। কিন্তু তীব্রতায় জ্বলজ্বল করছে।

প্রতিভাশালী একজন যুবক পাপের ছোঁয়ায় কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে আজ! বললেন—তুমি মিতার কাছে এলে কেন স্বপন?

স্বপন বলল—সরাসরি আপনার সঙ্গে যোগাযোগের সাহস পাইনি। আমার পিসতুতো দাদা মনোরঞ্জন পুলিসের আই বি অফিসার। তার কাছে আমি আছি। মনোদার পক্ষে আমার জন্য আর কিছু করা সম্ভব নয়। তাই মনোদা আজ আপনার সঙ্গে গোপনে দেখা করতে বলল আমাকে। কিন্তু আপনি কি ধরনের লোক আমি জানতুম না। হঠাৎ আমার মিতুদির কথা মনে পড়ে গেল।···স্বপন একটু হাসল আবার।—বানের জলে ভাসতে ভাসতে খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো আমার অবস্থা। ভাবলুম, মিতুদি শিক্ষিতা মহিলা। কলেজের অধ্যাপিকা। রাখীর জন্য বলতে এসে ওঁর অমায়িক ব্যবহার খুব ভাল লেগেছিল। এমন সিম্প্যাথেটিক মানুষ আর কখনও দেখিনি। ওঁকে যদি হাতে পায়ে ধরে আপনার কাছে পাঠাতে পারি—উনি আপনাকে সব বুঝিয়ে বলবেন। তারপর আমাকে নিয়ে যাবেন আপনার কাছে। এই ভেবে মরিয়া হয়ে আজ ওঁর কাছে এসেছিলুম।

কর্নেল চোখ বুজে শুনছিলেন। হুঁ, স্বপন জানত না!···এখনও জানে না যে অমিয় বকসীর সঙ্গে পারমিতার কি সম্পর্ক ছিল। জানলে কখনও ওঁর কাছে আসত না। বললেন···ঠিক আছে। তোমার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধার ব্যাপারটা বল। বলছিলে, তোমাকে নাকি গত রাতে খুনের চেষ্টা করেছিল কেউ।

স্বপন দ্রুত বলল···কেউ না, খুনী। যে অমিয় বকসী আর বাবাকে খুন করেছে। মনোদার কাছে আজ সকালে শুনেছি, অমর্ত্যদাও একইভাবে খুন হয়েছেন ক্লাবের মাঠে। একই লোকের কাজ। এবার আমার ব্যাপারটা বলি। ওই যে বললুম বানের জলে হেল্পলেস হয়ে ভাসছি। কাল ভেবে-ভেবে ঠিক করলুম, অমর্ত্যদার হেল্প নেব নাকি। তাঁকে আমি চন্দ্রার ব্যাপারে মারধর করেছিলুম। কিন্তু আফটার অল, মানুষ তো! একসময় আমাকে নিজের ভাইয়ের মতো স্নেহ করতেন। গিয়ে যদি হাতে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিই, উনি কি আমাকে হেল্প করবেন না? আপনি নিশ্চয় জানেন কর্নেল, অমর্ত্যদা খুব প্রভাবশালী লোক। সাংঘাতিক কোনো ব্যাপার চাপা দেবার ক্ষমতা ওঁর আছে।

—হুঁ। তারপর? গেলে তাঁর কাছে।

স্বপন শ্বাস ছেড়ে বলল—সন্ধ্যার একটু পরে গেলুম। গিয়ে দেখি ক্লাবের গেটের ওখানে একটা পুলিস ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। তখন স্টেডিয়ামের পেছন দিকটায় চলে গেলুম। এদিন ক্লাবের রেস্ট ডে আমি জানি। অমর্ত্যদা রেস্ট ডে-তে টেন্টে থাকবেনই। ওঁর এই একটা ভীষণ খারাপ দিক। কলগার্ল বা ব্রথেলগার্লদের—

পারমিতার দিকে তাকিয়েই সে থামলে কর্নেল বললেন—জানি। তুমি কি করলে তাই বল।

—আমার খুব চেনা জায়গা। প্রতিটি ইঞ্চি আমি চিনি। স্টেডিয়ামের পেছনে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটা অংশ আছে। ওখান দিয়ে ওঠা যায়। তারপর ওপারে গিয়ে পড়লে দর্শকের জন্য তক্তার ধাপ। ওখানটাতে আলো ছিল না। চোখে পড়ল, মাঠে প্রদীপ মৈত্র নামে রাইট ব্যাক বল প্র্যাকটিস করছে—জাস্ট ড্রিপলিং। ভেতরে নেমে গিয়ে ভাবলুম, প্রদীপকে দেখা দেব নাকি—তাকে দিয়েই অমর্ত্যদাকে টেন্ট থেকে ডেকে পাঠানো যায়। কিন্তু প্রদীপটা বড্ড বোকা ধরনের ছেলে। আমাকে দেখে ওর কি প্রতিক্রিয়া হবে বলা কঠিন। কিন্তু অবাক লাগছিল, প্রদীপ এখনও বল প্র্যাকটিস করছে কেন—আজ রেস্ট ডে-তে? অমর্ত্যদা নিয়ম-কানুনের ব্যাপারে খুব কড়া। তাহলে কি উনি নেই? এই সব ভাবছি, হঠাৎ পেছনে চাপা মচমচ শব্দ শুনলুম যেন। ঘুরে কিছু দেখতে পেলুম না প্রথমবার। দু নম্বর প্যাসেজের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলুম। একটু পরে আবার শব্দ হল। চমকে গিয়ে ঘুরে দেখি, আমার মতই কেউ গুঁড়ি মেরে একইভাবে নেমে আসছে ওপর থেকে। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম। পুলিস আমাকে ফলো করে এসেছে নাকি? কিন্তু পুলিস ওভাবে আসবে কেন? সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে প্যাসেজের ভেতর অন্ধকারে বসে পড়লুম। দৌড়ে পালাতে গেলে প্রদীপ চেঁচাবে। টেন্টের লোকেরা এসে যাবে। ওদিকে গেটে পুলিসের গাড়ি দেখেছি। আমাকে পালাতে হলে স্টেডিয়াম ডিঙিয়েই যেভাবে এসেছি, সেই ভাবে পালাতে হবে। কারণ আর কোনোও পথ নেই।

স্বপন দম নিয়ে আবার বলতে থাকল—আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। বসে আছি তো আছি। মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটু আলো পড়েছে—সেখানে প্রদীপ আপনমনে বলের সঙ্গে খেলছে, আর খেলছে বাচ্চা ছেলের

মতো। হঠাৎ আমার পেছনে একটা শব্দ হল। যেই ঘুরেছি, পাশের কাঠের তক্তার ওপর খটাস করে কি পড়ল। আবছা দেখতে পেলুম একটা লোককে। একেবারে পিঠের কাছে। তার হাতে কি একটা আছে—সেটাই তক্তার ওপর খটাস করে মেরেছে। সে হাত তুলতেই মাথাটা সরিয়ে নিলুম—খুব সংকীর্ণ প্যাসেজ তো!

কর্নেল তীক্ষ্ণদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—তারপর?

—আমার মাথার বাঁ পাশে লেগে পিছলে গেল কি একটা শক্ত ভোঁতা জিনিস। আমি সেটা ধরে ফেললুম। কিন্তু আঁটো জায়গা। লোকটা আচমকা আমার পেটে প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল। ঠোক্কর খেয়ে পড়লুম পাশের কাঠের খুঁটিতে। সামলে নিয়েই আমি ড্যাগার বের করলুম। কিন্তু আর তাকে দেখতে পেলুম না। দর্শকের আসনের নিচে সবটাই ফাঁকা। অজস্র কাঠের খুঁটি আছে শুধু। প্রচণ্ড অন্ধকার হয়ে আছে ভেতরটা। সেখানে ঢুকে গেছে লোকটা। এদিকে মাথায় হাত দিয়ে দেখি চটচট করছে। কাঁধ, পিঠ জ্বালা করছে। মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। অতি কষ্টে আবার গুঁড়ি মেরে দর্শকের আসন দিয়ে উঠে যে পথে এসেছিলুম, সেই পথে নেমে গেলুম। প্রদীপ তখনও আপনমনে খেলছিল।

—কোথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধলে?

—সোজা চৌরঙ্গী রোডে পৌঁছে একটা ফার্মেসিতে ঢুকে পড়লুম। বললুম, বাস থেকে পড়ে গেছি। একটু ডেটল-ফেটল লাগিয়ে দিন তো, দাদা! কাউণ্টারের লোকটি ভাল। খানিকটা তুলো, ডেটল আর গজ দিয়ে বেঁধে দিয়ে বলল, এক্ষুণি কোনো হসপিটালে চলে যান। যাইনি। ট্যাক্সি করে মনোদার বাড়িতে চলে গেলুম। মনোদা সবে নাইট ডিউটিতে বেরুচ্ছিল। খুব বকল। বউদি সব রক্ত-টক্ত ধুইয়ে নতুন করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল। বউদি আর. জি. কর হসপিটালের একজন সিস্টার। এ. টি. এস. ইনজেকশন দিল। আমার—

—হুঁ, তোমার কেন মনে হল ওই লোকটাই খুনী?

স্বপন একটু চুপ করে থেকে বলল—মনোদার কাছে শুনেছিলুম, অমিয় বকসী আর বাবাকে মাথায় হাতুড়ি মেরে খুন করা হয়েছে বলে ফরেন্সিক আর মর্গ থেকে সাজেস্ট করেছে। আমার মাথায় লোকটা যে জিনিসটা দিয়ে আঘাত করেছে, সেটাও একটা হাতুড়ি। হাতুড়িটা আমি ধরে ফেলেছিলুম। পেটে লাথি না মারলে কেড়ে নিতে পারতুম।

একটি কিশোরী চা আর স্ন্যাকসের প্লেট রেখে গেল। সে কিচেনের 'রজায় গিয়ে ঘুরে অবাক চোখে এদিকে তাকালে পারমিতা বললেন—তুই কি দেখছিস হাঁ করে? গ্যাস জ্বলছে। নিভিয়ে দিতে হবে না?

মেয়েটি ফিক করে হেসে ভেতরে ঢুকে গেল। স্বপন চায়ের কাপ তুলে লল—আমার আর থাকা উচিত হবে না, কর্নেল! চা খেয়েই কেটে পড়ব —কারেন্ট আসার আগে।

কর্নেল একটু হাসলেন।—না। তুমি আমার সঙ্গে যাবে।

স্বপন ভড়কে গিয়ে বলল—কোথায়?

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন—মাই ডিয়ার ইয়ংম্যান, তোমার মনোদার চয়ে আমার আস্তানা আরও নিরাপদ তোমার পক্ষে। তোমার মনোদাকে াকরি যাওয়া—এমন কি জেল খাটার রিস্ক্ নিতে বাধ্য কর না আর।

—কিন্তু আপনিও তো পুলিসের—

জোরে মাথা নেড়ে কর্নেল বললেন—আমি কারুর বেতনভোগী নই, ডার্লিং! পুলিস হওয়া তো দূরের কথা।

—কিন্তু আপনি তো ডিটেকটিভ!

—সে অর্থে নই। জাস্ট্ অপরাধ-বিজ্ঞানের একজন কৌতূহলী বুড়ো ছাত্র বলতে পার। মানুষের শিখতে শিখতে জীবন কেটে যায় বলে একটা কথা আছে না? পুলিস আমার সাহায্য চায় মাঝে মাঝে, একথা ঠিকই। কিন্তু আমার পথে আমি নিঃসঙ্গ. আমার হবি হল, প্রকৃত অপরাধীকে দেখিয়ে দেওয়া। তার সাজা হল না হল, সেটা দেখার দায়িত্ব আমার নয়। আইনরক্ষকদের এবং ব্যাপক অর্থে—সমাজের হাতে সে দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। সোজা কথায় এটা আমার এক ধরনের অন্বেষণ। মাত্র তিনটি ব্যাপার আমার এই অন্বেষণে সাহায্য করে। টেকনিক্যালি বলতে গেলে তা হল: মার্ডার উইপন্, মোডুস অপারেণ্ডি এবং মোটিফ। কি দিয়ে হত্যা করা হয়েছে, হত্যার পদ্ধতি বা পরিকল্পনা এবং হত্যার উদ্দেশ্য। পুরো ব্যাপারটা অঙ্কের নিয়মে আমি সাজিয়ে নিই! তথ্য থেকে ডিডাকশান পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছই। এই কেসে গোড়া থেকেই আমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে স্বপন, তোমাকে খাপ খাওয়াতে পারছিলুম না। আসলে অঙ্কেই ভুল ছিল। কারণ তথ্যের মধ্যে একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছিল। অনুমান দিয়ে সেই ফাঁক পূরণ করার ফলেই গণ্ডগোলটা বেধেছিল। এবার সেই অনুমানকে হটিয়ে তথ্য দাঁড়

করাতে পেরেছি। একটা হাতুড়ি, ডার্লিং, জাস্ট্ একটা হাতুড়ি! পুরো কেসটা দাঁড়িয়ে আছে একটা হাতুড়ির ওপর। নাও, ওঠ। দ্বিধা কোর না। এ বুড়ো যাকে রক্ষা করতে চায়, তাকে প্রাণ দিয়েও রক্ষা করতে প্রস্তুত।

কর্নেল চায়ের কাপ নামিয়ে রাখলেন। পারমিতা ব্যস্তভাবে বললেন—আমাকে কি জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলেন। কৈ, জিজ্ঞেস করলেন না তো?

—আর দরকার হচ্ছে না, মিতা। দা অ্যান্সার বুক ইজ হিয়ার। বলে স্বপনের কাঁধে হাত রাখলেন কর্নেল। তারপর নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন—ওই যে আজকাল স্কুলের বই বেরোয়—একের ভেতর তিন। থ্রি ইন ওয়ান। স্বপন, এস ডার্লিং।···

অরিজিৎ লাহিড়ী এলেন পরদিন বেলা এগারোটা নাগাদ। এসে বললেন ফোন না করেই এসে পড়লুম। কারণ আপনার আস্তানা থেকে সামান্য দূরে জাস্ট্ ফিফ্‌টিন মিনিটস ওয়াকিং ডিস্‌ট্যান্সে পুলিস অপারেশন ছিল। সেখান থেকে সোজা চলে এলুম।

কর্নেল উদ্ভিদ বিজ্ঞানের কেতাব বুজিয়ে রেখে বললেন, ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে গি জেভিয়ারের বাড়িতে।

—দ্যাটস রাইট। অরিজিৎ মিটিমিটি হেসে বললেন—কাল বিকেলে আপনি কেটির ঘরে ঢুকেছিলেন!

কর্নেল অট্টহাস্য করলেন।—এ বুড়ো বয়সে কি কেলেঙ্কারি! যাই হোক আসল কথাটা বল।

—জেভিয়ারের ঘরে হানা দিয়ে চন্দ্রার জিনিসপত্র সিজ করেছি। বুঝতে পেরেছি কেন ওর সঙ্গে অমর্ত্যবাবু ঝগড়া করতে গিয়েছিলেন।

কর্নেল আগ্রহী হয়ে বললেন—কি পেয়েছ আগে তাই বল।

—চন্দ্রার কাপড়-চোপড়, বেডিংপত্র আর চারটে ফটো। ফেটোগুলো ইন্টারেস্টিং। দেখাচ্ছি।

অ্যাটাচি থেকে খাম বের করলেন অরিজিৎ। খামের ভেতর থেকে চার ছবি বের করে বললেন, এই ছবিটা ইন্টারেস্টিং নয়? আমি তো কল্পনা করিনি যে অমিয়বাবুর সঙ্গে এই মেয়েটিরও সম্পর্ক ছিল।

কর্নেল ছবিটা হাতে নিয়ে দেখতে থাকলেন। তের-চোদ্দ বছরের এব

সুন্দর ফুটফুটে মেয়েকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে চেয়ারে বসে আছেন যিনি, তিনি অমিয় বকসী। মেয়েটি তাঁর কোলে বসেছে। তার কাঁধে চিবুক অমিয়বাবুর। গালে গাল ঠেকে আছে। মেয়েটির মুখে হাসি। কিন্তু এ হাসি কি স্বাভাবিক? লজ্জা আর বিব্রত বোধ করলে যেমন ভাব ফুটে ওঠে এবং যেন বিরক্তিতে। কর্নেল বললেন—এই কি চন্দ্রা?

—হ্যাঁ। কারণ গত বছরের তারিখ লেখা স্বপনের পাশে তার এই ছবিটা দেখুন!

কর্নেল দেখলেন। সেই কিশোরীই এ ছবিতে যুবতী। পাশে তার কাঁধে হাত রেখে স্বপন।

—এবার এই ছবিটা দেখুন। বাচ্চা চন্দ্রার প্রোফাইল।

কর্নেলের মুখে বিষন্নতা ফুটে উঠল। নিষ্পাপ হাসিখুশি এক শিশু-মুখে স্বর্গের সুষমা। পাপের হাত পড়েছিল তার গায়ে। জোর শ্বাস ছেড়ে বললেন—কি শোচনীয় পরিণতি হতভাগিনীর।

—এই ছবিটা একটু গোলমেলে। দুপাশে দুটো চেয়ারে এই ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা নিশ্চয় চন্দ্রার বাবা-মা। মধ্যিখানে ছোট্ট মেয়েটি চন্দ্রা। কিন্তু ভদ্রমহিলাকে খুব চেনা লাগে। উজ্জ্বলবাবুর সঙ্গে যে মহিলার ছবি আছে, তাঁর সঙ্গে কেমন মিল আছে না? ছবিটা তো আপনার কাছে আছে! মিলিয়ে দেখুন না!

কর্নেল ড্রয়ার থেকে ছবিটা এনে পাশে রেখেই শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠলেন—অরিজিৎ! এই হতভাগ্য মেয়েটা—এই চন্দ্রা কে, তা বুঝতে পারছ কি এবার?

অরিজিৎ চমকে উঠলেন।—কে?

—অপালা। অমিয় বকসীর স্ত্রী মৃদুলার আগের স্বামীর ঔরসজাত সন্তান। কর্নেল উত্তেজিত হলেন আবার।—অপালা তার মায়ের আত্মহত্যার পর নিরুদ্দিষ্ট হয়েছিল। অমিয় তার জন্য কেন পাগল হয়ে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন—কেন তিনটে বছর সিনেমা ছেড়ে দিয়েছিলেন, পরিষ্কার হয়ে গেল।

—খুব স্নেহ করতেন তাহলে!

—স্নেহ? কর্নেলের চোখ দুটো জ্বলে উঠল।—অরিজিৎ! অমিয় বকসী ছিলেন একটি কামার্ত পশু। ওই ছবিটা দেখে কি তোমার মনে হচ্ছে

পিতৃতুল্য কোনো মানুষ ওইভাবে কিশোরী কন্যাকে অশালীনভাবে জড়িয়ে ধরে ছবি তুলতে পারেন? সৎ বাবার অত্যাচারে অপালা ঘর ছেড়েছিল, এটা স্পষ্ট। তার মায়ের আত্মহত্যার কারণও হয়তো তাই।

অরিজিৎ বললেন—স্বপনকে আর ঈশ্বরের সাধ্য নেই বাঁচায়। চন্দ্রা ছিল তার প্রেমিকা। চন্দ্রার কাছে সব কথা জানার পর সে অমিয়বাবুকে –

কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন—এই ছবিগুলো আমার চাই।

—এগুলো কোর্টে একজিবিট করতে হবে। ঠিক আছে, কাল ফেরত দেবেন।

—দেব। সীমন্তর কাজে এগুলোর কপি করিয়ে নেব আজই। চিন্তা কর না।

এই সময় ফোন বাজল। কর্নেল হাত বাড়িয়ে ফোন তুলে সাড়া দিলেন। তারপর ঘুরে বললেন—তোমার ফোন অরিজিৎ!

অরিজিৎ বিরক্ত হয়ে বললেন—জ্বালাতন! এখানে আছি কে বলল ওদের?

কর্নেল সকৌতুকে বললেন—গোয়েন্দাকর্তার পেছনেও গোয়েন্দা ঘুরছে, ডার্লিং!

অরিজিৎ ফোন তুলেই কড়া ধমক দিলেন।—এখানে আছি কে বলল আপনাকে?...তারপর একটু ঘুরে কর্নেলের দিকে কটাক্ষ করলেন।—হ্যাঁ, বলুন।...ইজ ইট?...সে কি! আশ্চর্য তো!...ওকে! ওই ভদ্রলোককে ধরে আনার ব্যবস্থা করুন!...ইয়েস, দ্যাট ব্লাডি কণ্ট্রাক্টারকে। কি যেন নাম ব্যাটার? ..হ্যাঁ, সরল সেন। নাম সরল, লোকটা মোটেও সরল নয় দেখা যাচ্ছে। ইয়েস, মিসলিড করেছে।...হ্যাঁ, ডেলিবারেটলি করেছে এটা। ওকে অ্যারেস্ট করুন।...নো, নো। আই ডোণ্ট কেয়ার বালক অর নাবালক এনি ড্যাম পার্সন হু এভার হি ইজ!...শুনুন, আপনার ওই বালক না নাবালক যদি ট্রাবল পাকায়, তাকেও অ্যারেস্ট করুন! মাই রেসপনসিবিলিটি। গুঁতোর চোটে বেরিয়ে আসবে সব কথা!...ওকে। ছাড়ছি।

অরিজিতের মুখ লাল হয়ে গেছে রাগে। ফোন ছেড়ে বসতেই কর্নেল বললেন—মেদিনীপুরের সেই গ্রামে বনবিহারী দাস নামে কোনো লোককে পাওয়া যায়নি। তাই তো?

অরিজিৎ সিগারেট ধরিয়ে বললেন—নাঃ!

—কিন্তু আবার যে সব জট পাকিয়ে গেল !

—মোটেও না। পুরো জট খুলে গেল। সরলবাবুর দৌলতে সব সরল হয়ে গেল।

অরিজিৎ ভুরু কুঁচকে বললেন—বুঝতে পারছি না।

কর্নেল সোজা হয়ে বসে বললেন—ভুয়ো ঠিকানা দেওয়াতে কি প্রমাণিত হল না যে সরলবাবুর সঙ্গে যে ইলেকট্রিশিয়ান এসেছিল, সেই অমর্ত্যবাবুকে খুন করেছে ? সে হাওড়া স্টেশনে যাবার নাম করে সরলবাবুর সঙ্গে ফিরে যায় নি। ক্লাবের আনাচেকানাচে অপেক্ষা করছিল। তারপর স্টেডিয়ামের পেছন দিয়ে খুঁটি বেয়ে উঠে—

—প্রমাণ কি ?

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন—প্রমাণ আমার হস্তগত হয়েছে। আপাততঃ আমি তুরুপের তাসটি কাউকে দেখাতে চাইনে অরিজিৎ ! এ বুড়োর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ো না। দুটো দিন অপেক্ষা কর। আমি এই সব হত্যাকাণ্ডের নায়ককে হাতে-নাতে ধরিয়ে দেব।

—এমনও তো হতে পারে অরিজিৎ, সরল সেন তোমাদের ঠিকই ঠিকানা দিয়েছিলেন—আসলে বনবিহারী তাঁকে ভুয়া ঠিকানা দিয়েছিল—তাই সরলবাবুর কোনো দোষ নেই ?

—ধোলাই খেলে সেটা বেরিয়ে পড়বে।

—না অরিজিৎ। খামোকা এসব করতে যেও না। কোনো লাভ হবে না।

—আপনার বুদ্ধিসুদ্ধি ক্ষমতার ওপর আমার ভরসা আছে। বাট দিস ইজ জাস্ট এ প্রফেসি !

—ডার্লিং, তুমি উত্তেজিত। শান্ত হও। এ মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি মাথা ঠাণ্ডা রাখা। নইলে খুনীকে আবার ভিড়ে হারিয়ে ফেলব। আর তার দেখা পাব না।

অরিজিৎ একটু হাসলেন।—ওকে।

কর্নেল হাঁক দিলেন। ষষ্ঠী! তোর নালবাজারের নাহিড়ী সায়েবকে একটা কোল্ড ড্রিংক দিয়ে যা বাবা !

ষষ্ঠী ওত পেতে দাঁড়িয়েছিল। সে উদ্বিগ্ন। বাবামশাই তাকে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা যুবকটির ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। ঝটপট ফ্রিজ থেকে একটা কোল্ড ড্রিংক দিয়ে গেল।

অরিজিৎ গ্লাসে ঢেলে চুমুক দিয়ে বললেন—আসলে খবরের কাগজগুলো বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। বিশেষ করে আপনার স্নেহধন্য জয়ন্তবাবুর দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা। আজ কি সম্পাদকীয় লিখেছে পড়েছেন? জয়ন্তবাবু থাকলে ওঁকে বলতুম—

—জয়ন্ত এখন স্টেটসে মার্কিন সুন্দরীদের সান্নিধ্যে স্বর্গবাস করছে। মিয়ামি বিচে শুয়ে আছে। কাল ওর চিঠি পেলুম।

—কর্নেল সিরিয়াসলি বলছি। শীগগির এই কেসের ফয়সালা করতে না পারলে আমি রেজিগনেশান দেব—দিতে বাধ্য হব। ইতিমধ্যে কথা উঠেছে আমি সিনেমা মহলের কাউকে নাকি গার্ড দিচ্ছি। কেসটা চাপা দেওয়ার তাল করছি। কারণ আমি একসময় সিনেমা লাইনে ঘোরাঘুরি করতাম। ডকুমেন্টারি করেছিলুম গোটাদুই।

—তা তো করেছ'ই। কার আর্ট ফিল্মে সুরকারও ছিলে যেন?

—হ্যাঁ। কিছু দেশী বিদেশী মিউজিক পাঞ্চ করে ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক কম্পোজ করেছিলুম। কিন্তু পুলিসে ঢুকেছি তার কত্তো পারে!

—সুতরাং ডার্লিং, লোকে পাঁচ কথা বলতেই পারে। কান দিও না। ওয়েট ওনলি ফর টুডেজ। আমি একটা ফাঁদ তৈরি করছি। কর্নেল দুটো আঙুল তুলে হাসলেন। তারপর গম্ভীর হলেন আগের মতো। হ্যাঁ, একটা ফাঁদ। খুব রিস্ক আছে। তবু উপায় নেই। সমস্যা শুধু, এই ফাঁদ তৈরি করার জন্যই খুনীর মোটিফ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দরকার। মোটিফ জানতে হলে লোকটার আসল পরিচয় জানা দরকার। এই পরিচয় জানার জন্যই দুটো দিন সময় নিতে চাই? আশাকরি আটচল্লিশ ঘণ্টা সময়ই সেজন্য যথেষ্ট।...

অরিজিৎ লাহিড়ী চলে গেলে কর্নেল বাইরের দরজা বন্ধ করে এলেন নিজের হাতে। ষষ্ঠীই কাজটা করে। ড্রয়িংরুম হয়ে ল্যাবরেটরিতে ঢুকলেন। তারপর পর্দা তুলে পেছনের দিকে বেডরুমে গেলেন। স্বপন একটা ক্যাম্পখাটে শুয়ে কাগজের খেলার পাতা পড়ছিল। উঠে বসল। নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল সে—ষষ্ঠী বলছিল লালবাজারের কোন অফিসার এসেছে।

—ভয় পেয়েছিলে তো?

—একটু যে পাইনি, তা নয়।

কর্নেল বসে বললেন—এই ছবিগুলো দেখ। চন্দ্রার জিনিসপত্রের সঙ্গে ছিল।

স্বপন ছবিগুলো দেখেই বলল—আমার দেখা ছবি!

—এই ছবিটা বাবা-মায়ের সঙ্গে চন্দ্রার

—হ্যাঁ। ওর ছোটবেলার ছবি। আমি একটা কারণে খুব অবাক হয়েছিলুম। ওর মাকে চিনতে পেরে। আমার বাবার সঙ্গে ভদ্রমহিলাকে দেখেছিলুম যেন বারকয়েক। আমার অবশ্য ভুল হতেও পারে।

—তোমার ভুল হয়নি।

—চন্দ্রা বলত ওর মা অ্যাকট্রেস ছিল। খুব বড়লোক ছিলেন নাকি ওর দাদামশাই। মদ আর জুয়ো খেলে সর্বস্বান্ত হয়ে মারা যান। তবে চন্দ্রার খুব একটা শ্রদ্ধা ছিল না মায়ের সম্পর্কে। খুব ঘেন্না করে মায়ের কথা বলত। বলত, মা ছিল আমার চেয়ে বেশী নষ্ট মেয়ে। তখন চন্দ্রার ব্লাডক্যান্সার ধরা পড়েছে। তবু কিছুতেই হসপিট্যালে যাবে না।

—হুঁ। সে সব কথা তো বলেছ। ওর বাবার সম্পর্কে খুব অভিমান ছিল। তাই না?

—ভীষণ। তবে বাবার জন্য সে কেঁদেও ফেলত।

—ওর বাবার নাম মনে করতে পারলে?

—মাথায় চোট খেয়ে কি যেন হয়েছে। কিছুতেই মনে পড়ছে না। পেটে আসছে, মুখে আসছে না। অথচ নামটা অত্যন্ত কমন। সু-সুনীল, না সুরেশ—উঁহু। অন্য কিছু।

—চন্দ্রা তোমাকে বলেছিল, ওর মা ওর বাবাকে ডিভোর্স করেছিল কেন?

—কাল রাতে তো বললুম। আসলে ভদ্রলোক—মানে চন্দ্রার বাবা ওসব পছন্দ করতেন না।

—অভিনয়ের লাইনে যাওয়া?

—হ্যাঁ। খুব সাদাসিধে লোক ছিলেন। ধর্মভীরু টাইপ। ফ্যাসান সহ্য করতে পারতেন না। বাবার ভয়ে চন্দ্রা একটু সাজতেও ভয় পেত। বাবা ওকে খুব বকাবকি করতেন। চন্দ্রা বলত, দাদামশাইয়ের অবস্থা পড়ে না এলে তার বাবার সঙ্গে তার মায়ের বিয়েই হত না।

—কেন?

—ওর বাবা সামান্য একজন ইলেকট্রিক মিস্তিরি ছিলেন।

কর্নেল নড়ে বসলেন।—এ কথাটা তো বলে নি!

স্বপন কাঁচুমাচু মুখে হাসল।—সব কথা খেয়াল করা যাচ্ছে না।

মাথায় চোট খেয়ে কি একটা হয়েছে। সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে খালি।

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন হঠাৎ। ফের বললেন—চন্দ্রা বলেছিল ওর বাবা ইলেকট্রিক মিস্তিরি ছিলেন ?

—হ্যাঁ। স্পষ্ট মনে আছে।

কর্নেল আস্তে বললেন—ঠিক আছে। তুমি স্নান করে ফেল। না—ব্যাণ্ডেজ থাক। গলাঅব্দি যথেষ্ট। বাথটাবে অসুবিধে হবে না তো ? অলরাইট।

যেতে যেতে একটু হেসে বলে গেলেন ফের—হুঁ। বাথটাবে জলের ভেতর শুয়ে থাকতে থাকতে দেখ যদি মনে পড়ে নামটা ....

খবর পেয়ে ছুটোর মধ্যে এসে গেল সীমন্ত। কর্নেল বললেন—তোমাকে একটা ফটো রিপ্রিন্ট করতে দেব। সেজন্য ডেকেছি।

বলে খাম খুলে বাবা-মায়ের সঙ্গে চন্দ্রার ছবিটা বের করলেন।

সীমন্ত বলল—কাদের ছবি ?

কর্নেল হাসলেন।—প্রশ্ন কর না। আর একটা কথা। তোমার স্টুডিও থেকে বড্ড ছবি চুরি যায়। কাজেই এটা যতক্ষণ রিপ্রিন্ট না হবে, ততক্ষণ আমি বসে পাহারা দেব।

সীমন্ত অপ্রতিভ হয়ে বলল—সে তো ওই একবার। বজ্জাত স্বপনটা—

কর্নেল ঠোঁটে আঙুল রেখে বললেন—চুপ, চুপ। দেয়ালের কান আছে। হুঁ, শুধু এই ভদ্রলোকের ছবিটাই রিপ্রিন্ট করতে হবে বড়ো আকারে। এই মহিলা আর বাচ্চাটাকে বাদ দিয়ে। কতক্ষণ লাগবে ? হাতে সময় কম। কত কম সময়ে পার, বল ? নইলে অন্যত্র—

সীমন্তের আঁতে লাগল। ঝটপট বলল—তিন ঘণ্টা যথেষ্ট। আমার যে মডার্ন লেটেস্ট ইকুইপমেন্ট আছে, কলকাতায় কারুর নেই। বাচ্চুদার সঙ্গে খিদিরপুর এরিয়ার এক স্মাগলারের প্রচণ্ড জানাশোনা আছে। বাচ্চুদাকে ধরে গত মাসে কিছু জিনিস যা যোগাড় করেছি, কেউ কল্পনা করতে পারবে না।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন—কিন্তু আমি উপস্থিত থাকব।

সীমন্ত উৎসাহে উঠে দাঁড়াল।—ছাটস মাই অনার। চলুন।

সীমন্ত গাড়ি এনেছিল। কর্নেল ওর গাড়িতেই চললেন। গড়িয়াহাটে মুনলাইট স্টুডিওতে পৌঁছে সীমন্ত ছবি তোলার কেবিনে ঢুকল। কর্নেল ওর কর্মচারী দু'জনের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন।

কর্নেল অন্যের মুখ খুলে দিতে সিদ্ধহস্ত। একজন কর্মচারী খদ্দের সামলাতে সামলাতে আলোচনায় যোগ দিচ্ছিল। ফটো নিতে আসছে যারা, তারা বিরক্ত। অন্যজন মুখ খুলে দিয়েছে। তার কথায় পূর্ববঙ্গীয় টান দেখেই কর্নেল সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পাখি, মাছ, ধানক্ষেতের একটু প্রশংসাজনক উল্লেখ করা মাত্র তার নস্টালজিয়া এসে গেছে। সে অনর্গল ফরিদপুরের কথা বলে চলেছে। অন্যজন ময়মনসিংহের লোক। তরিতরকারির সূত্র পেয়েই সে ফুঁসে উঠল—হাঃ! বাইগনের কথা কি কইলেন ধরণীদা? বাইগন আছিল আমাগো জেলায় পাক্কি তিন সের ওজন একেকটা।...

কর্নেল জানেন, কাউকে কথা বলাতে হলে তার দুবল জায়গাটা খুঁজে বের করতে হয়। এই মানুষগুলো কবে দেশ ছেড়ে চলে এসেছে। তখন হয়তো কিশোর বা বালক মাত্র। কিন্তু ওই বয়সের যা কিছু স্মৃতি, মানুষকে বড় আচ্ছন্ন রাখে। এরা বাধ্য হয়ে চলে এসেছে অবস্থার চাপে। তাই মায়া কাটাতে পারেনি। অবচেতনায় সেই মায়া বর্ণাঢ্য হয়ে রয়েছে। একটু ফাঁক পেলেই উৎসারিত হয় সেই মায়ারঞ্জিত স্মৃতি। হৃদয় খুলে দেয় অবাধে।

সময় কাটানো দরকার। তিন ঘণ্টা সময়। সেই ফাঁকে নিজের মধ্যেও ডুবে যাচ্ছেন। 'বনবিহারী দাস'কে লক্ষ্য করছেন মনের ভেতর। একজন ইলেকট্রিশিয়ান তার হাতুড়ি নিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের দিকে, যারা তার সাধের সংসারকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে—জেনে বা না জেনে। তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। তার আদরের মেয়েকে নষ্ট করেছে। পাপের পথে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে ওদের। সে লোকগুলোকে ক্ষমা করতে পারছে না। অমিয় বকসী, তারপর উজ্জ্বলকুমার, তারপর অমর্ত্য রায়, এবং স্বপন অধিকারী। স্বপনকে সে কায়দা করতে পারেনি। আঘাত হেনেছিল। ফস্কে গেছে দৈবাৎ। স্বপন এখন বেঁচে আছে।

হুঁ—স্বপনকে আপাততঃ সে পাচ্ছে না। স্বপন নিরাপদ দুর্গে আছে বলা যায়। তবে ষষ্ঠীটা একটু বোকা। সেজন্যই ভাবনা হয়।

চমকে উঠলেন কথাটা ভেবেই। কাউন্টারে টেলিফোন আছে। ফোন

তুলে ডায়াল করলেন। ষষ্ঠীর সাড়া পেয়ে বললেন—বাবামশাই বলছি রে! কোনো খবর আছে?

—বাবামশাই? কোত্থেকে বলছেন?

—আঃ! খবর আছে কিছু?

—আজ্ঞে না।…আজ্ঞে হ্যাঁ, হ্যাঁ। এইমাত্তর নালবাজারের নাহিড়ী সায়েব ফোং করেছিলেন। বললেন, ফিরলে ফোং করতে বল।

—আর কিছু?

—না।

—তোর দাদাবাবু কি করছে?

—ছাদে বসে কফি খাচ্ছেন। খেতে খেতে ম্যাগাজিং পড়ছেন।

—ঠিক আছে। কেউ এলে বলবি—কি বলবি?

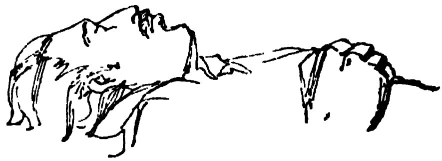
—নেই বলব। মানে—বাবামশাই নেই।

—আর?

—মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেব। সে নালবাজারের নাহিড়ী সায়েব হোক, আর নাটসায়েব হোক।

—ঠিক আছে। কর্নেল ফোন রাখলেন।

সীমন্ত উত্তেজিতভাবে বেরিয়ে এল এনলার্জ করা ভিজে ছবি নিয়ে।—এ কি কর্নেল! এ তো দেখছি সরলদার কর্মচারী বনবিহারী। ইলেকট্রিশিয়ান, মায়াপুরী স্টুডিওতে থাকে ঘর পাচ্ছিল না বলে সরলদাকে ধরে ম্যানেজ করেছে। এর ছবি কি হবে বলুন তো?



॥ দশ ॥

মায়াপুরী স্টুডিওতে প্রতিভা পিকচার্সের ঘরে রথীন্দ্র কুশারী কথা বলছিলেন বালক দাশগুপ্তের সঙ্গে। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে। স্টুডিওতে আজকাল সন্ধ্যার পর সুটিং হলে এক নম্বর ফ্লোরে—কারণ এই ফ্লোরটা গেটের খুব কাছে। লোকজন ভুলেও আলোর বাইরে পা বাড়ায় না। এমনিতেই সুটিং কমে গেছে। স্টুডিও কর্তৃপক্ষ খুব চিন্তিত। একে বাংলা ছবির অবস্থা করুণ। তাতে এই স্টুডিও যেটুকু ঢিমেতালে চলছিল, পর-পর দুটি হত্যাকাণ্ডের ফলে তাও যেন চলছে না। রথীন্দ্র কুশারীর মায়াপুরীতে শেয়ার আছে। জেদী ও সাহসী লোক। বালকবাবুকে বলছিলেন—অমিয় চলে গেল। খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলুম কয়েকটা দিন। পরে দেখলুম, আমি যদি পিছিয়ে থাকি, মায়াপুরীর নাভিশ্বাস শুরু হবে। কাজেই ছবি আমি করব। তবে ওই সব পাতাল-টাতাল আর নয়।···হাসলেন রথীন্দ্র।

বালকবাবু বললেন, বেশ তো। আমার হাতের ছবিটা প্রায় শেষ। আর দুদিনের টুকিটাকি একটু কাজ আছে। আউটডোরে সেরে নেব। তারপর—আমার ব্যাপার জান তো? তিন মাসে পারলে চার মাস করি না।

—হ্যাঁ তুমি স্পিডি খুব। রথীন্দ্র আড়মোড়া দিয়ে বললেন।—গল্প তুমিই দেখে নাও। কাস্টিং-টাস্টিং এভরিথিং তোমার। আমাকেও তো জান। কক্ষণো ইন্টারফিয়ার করি না। তা ছাড়া ডিসট্রিবিউটার আমার বাঁধা। রিলিজে দেরি হবে না। খুব ভালো চেইন আছে রিলিজের।

ক্যান্টিন-বয় সুরেশ এসে বলল—বাবুর ফোন।

রথীন্দ্র বললেন—কোন্ বাবুর?

সুরেশ দু'জনের দিকে তাকিয়ে বলল—বাচ্চুবাবু কে, তাঁর।

—মারব এক থাপ্পড়! বলে হাত তুলে হাসতে হাসতে রথীন্দ্র উঠলেন। —বস সাঁটুল! আসছি।

রথীন্দ্র গেলে একা নিঝুম পরিবেশে অস্বস্তি লাগছিল বালকবাবুর। বাইরে খোলা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। সিগারেট ধরালেন। বাগানের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালেন। এখন হঠাৎ লোডশেডিং হলেই বিপদ। মায়াপুরী এখন মৃত্যুপুরী হয়ে গেছে।

রথীন্দ্র তাড়াতাড়ি এসে গেলেন।—সীমন্ত কর্নেল সায়েবকে নিয়ে আসছে। থাকতে বলল।

—কর্নেল সায়েব? সে আবার কে?

রথীন্দ্র একটু হাসলেন।—তুমি চেনো না ওঁকে? ভেরী ইন্টারেস্টিং ম্যান। আসুন না, দেখবে। এস-ভেতরে গিয়ে বসি। আমরা ছাড়া তো দেখছি আজ ধুনি জ্বালানোর একটা লোকও নেই মায়াপুরীতে।

বালকবাবু বললেন—লোডশেডিং হলে মুশকিল। আমার ভাই আজকাল কি হয়েছে--মানে অমিয় বা উজ্জ্বলদার মৃত্যুর পরে অতটা হয়নি। অমর্ত্যটার মৃত্যুর পরে কেমন একটা যেন আনক্যানি ফিলিং হচ্ছে খালি। খেলার ক্লাবের কথা ভাবলেই কেমন যেন লাগছে। স্টুডিওতে এসেও তাই।

ভেতরে গিয়ে টেবিলে মোম বের করে রেখে রথীন্দ্র বললেন—দেখ ভাই সাঁটুল। আমার কথাবার্তা স্ট্রেটকাট। পাপ করলে তার ফল ভুগতে হবে—এই হল আসল কথা। অমিয়কে আমি লাইক করতুম ওর গুণের জন্য। কিন্তু তুমি যেমন জান, আমিও তেমনি জানি, অমিয় কী ছিল। আর উজ্জ্বলের কথা তো বলতে নেই। তুমি অমর্ত্যর কথা বলছ? জান না অমর্ত্য কী মাল ছিল? সাঁটুল, তুমি যদি কারুর সর্বনাশ না করে থাক, তোমার সর্বনাশ কেউ করবে না। মানুষ মানুষকে কি এমনি এমনি খুন করে রে ভাই? ঘা খেয়ে খেয়ে, ঘা খেয়ে খেয়ে যখন আর সহ্য করতে পারে না, তখন—ওই যাঃ। তুমি মাইরিবড্ড ইয়ে। লোডশেডিং-লোডশেডিং করে তাকে ডেকে এনে তবে ছাড়লে!

বালকবাবু নার্ভাস ভঙ্গিতে শুকনো হাসি ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। অন্ধকারে আস্তে বললেন—মোম জ্বাল!

রথীন্দ্র মোম জ্বেলে হাসলেন। কেটে পড়তুম এবার। কিন্তু সীমন্তটা জট পাকিয়ে দিল। এসো। মুখে যতই বলি, আমারও একা থাকার সাহস নেই —মাইরি!

সুরেশ টর্চ জ্বেলে ছুটো চা দিয়ে গেল। রথীন্দ্র বলে এসেছিলেন আরেকদফা চায়ের কথা।

একটু পরে বাইরে সীমন্তের সাড়া পাওয়া গেল—বাচ্চুদা!

রথীন্দ্র সাড়া দিলেন।—চলে আয়। আলো দেখাতে হবে নাকি?

—না। টর্চ আছে।

কর্নেল বারান্দায়। সীমন্ত উঁকি মেরে বলল—উরে ব্বাস! বালকদা যে!

রথীন্দ্র বললেন—কর্নেল! ভেতরে আসুন!

কর্নেল খোলা বারান্দার রেলিঙে ঝুঁকে নিচের আধতলাটা দেখার চেষ্টা করছিলেন টর্চের আলো ফেলে। উনি আসছেন না দেখে রথীন্দ্র বেরিয়ে গেলেন। অবাক হয়ে বললেন—কী দেখছেন?

কর্নেল বললেন—আমার সঙ্গে একটু আসুন। নিচে' গিয়ে বলছি। শুধু আপনি একা।

রথীন্দ্রের মুখে বিস্ময়। দরজায় উঁকি মেরে বললেন—সাঁটুল, সীমন্ত! তোমরা গল্প কর। আমরা আসছি।

নীচে গিয়ে কর্নেল বললেন—ইলেকট্রিশিয়ান বনবিহারী দাশকে আপনি নিশ্চয় চেনেন?

—হ্যাঁ। সে তো কণ্ট্রাক্টার সরলবাবুর লোক। কেন বলুন তো?

—সীমন্তর কাছে শুনলুম, বনবিহারী এই নিচেতলার একটা ঘুপটি ঘরে থাকেন!

—হ্যাঁ। থাকতে দেখেছি। কিন্তু কি—

—প্লিজ, আগে ওর ঘর কোনটা বলুন!

রথীন্দ্র পা বাড়িয়ে বললেন—নীচের ঘরগুলো স্টুডিওর গোডাউন। ওই শেষদিকের একটা ঘর খালি পড়েছিল। গত মাসে সরলবাবু রিকোয়েস্ট করল, ঘরটা যদি ওঁর একজন ইলেকট্রিসিয়ানকে দিই-ভাড়ার অসুবিধে হবে না। বেচারা থাকে সেই দমদম না কোথায়। কাজের অসুবিধে হয়। যাই হোক, সরলবাবুর অনুরোধে ব্যবস্থা করে দিয়েছি।……এই যে এই ঘরটা। তালাবন্ধ দেখছি। রথীন্দ্র ঘুরে দাঁড়ালেন।—নেই। কোথাও গেছে-টেছে। এসে যাবে'খন। খুব দরকার নাকি?

কর্নেল বললেন—তালাটা ভাঙা দরকার। ভেতরটা দেখতে চাই।

রথীন্দ্র আরও চমকে গেলেন।—কাজটা বেআইনি হবে না?

—না। পুলিসেরই এতক্ষণ এ ঘরে ঢোকা উচিত ছিল। ওরা গুরুত্ব দিচ্ছে না।····· বলে কর্নেল তালায় হ্যাঁচকা টান দিলেন। উপড়ে এল মরচে ধরা কড়াসুদ্ধ। দরজা খুলে ঢুকে টর্চের আলোয় ভেতরটা দেখতে থাকলেন। রথীন্দ্র হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে।

স্যাঁতসেঁতে মেঝেয় একটা মাদুরসুদ্ধ বিছানা গোটানো। একটা জলের কুঁজো এবং কাঁচের গ্লাস। নোংরা পলেস্তারাখসা দেয়ালে একটা মাকালীর ক্যালেণ্ডার টাঙানো। জানলাহীন বদ্ধ ঘর। ভ্যাপসা গন্ধ। এই ঘরে হতভাগিনী অপালা ওরফে চন্দ্রার বাবা এসে আশ্রয় নিয়েছিল। অমিয় বকসী আর উজ্জ্বলকুমারকে নরকে ঢোকানোর জন্যই সে তাঁদের কর্মস্থানে ঢুকে ওত পেতেছিল। তার পক্ষে এইটাই ছিল উপযুক্ত বধ্যভূমি। স্টুডিও এলাকার বাগান, পুকুর, জঙ্গল তার মতো হত্যাকারীর পক্ষে—যার কিনা হাতুড়ি ছাড়া অন্য অস্ত্রে হাত খোলে না, অত্যন্ত নিরাপদ ক্ষেত্র।

বিছানাটা টেনে বিছিয়ে দিলেন কর্নেল। একটা জীর্ণ তোষকের ওপর সস্তা ছিটের চাদর। নোংরা বালিশ। কোনোরকমে নিছক বেঁচে থাকার জন্য যেটুকু চাই, তার বেশী কিছু ঘরে নেই।

বালিশটা পরীক্ষা করছিলেন কর্নেল। খোলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা পুরোনো ছেঁড়া মলাটের এক্সারাইজ বুক। খুলেই অবাক হলেন। অপটু হস্তাক্ষরে ইংরেজি বাক্য, বাংলা বাক্য। বানান সংশোধন করা হয়েছে লাল কালিতে। তলায় লেখা : মিস অপালা গুপ্ত। কুমারী অপালা গুপ্ত। ইংরেজী ও বাংলায়। ক্লাস থ্রি। স্কুলের নাম লেখা অংশটা ছেঁড়া।

একটা পাতা উল্টে দেখলেন, লেখা আছে :

Q. 1 What is your father's name ?

My father's name is Mr. Shibashankar Gupta.

Q 2. What is your mother's name ?

My mother's name is Mrs. Mridula Rani Gupta.

দ্রুত পাতা ওল্টালেন। রথীন্দ্র এসে উঁকি মেরে দেখছেন। তাঁর দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এ পাতায় লেখা আছে :

'আমি বড় হইয়া দেশের সেবা করিব। পরিবারের উপকার করিব। রুগ্ন লোকের প্রতি যত্ন লইব। আমি একজন আদর্শ নারী হইব।'···

হুঁ, শ্রুতলিখন লিখেছে অপালা। ভুল বানান শুদ্ধ করা হয়েছে। তার বাবাই করেছেন। কারণ পাশে গুড লিখে 'এস জি' ইনিসিয়াল করা আছে।

পরের পাতায়: 'আমার বাবা খুব ভাল, আমার মা খুব ভাল। বাবা আমাকে ভালবাসে। বাবা আমাকে বকে। মা বকে না। পাশে বাবার মন্তব্য: 'দুষ্টু মেয়ে! আমি বকি বুঝি?'

কর্নেল! রথীন্দ্র ডাকলেন।

কর্নেল খাতা ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে ধরা গলায় বললেন—হ্যাঁ, চলুন। বাইরে গিয়ে রুমাল বের করে চোখ মুছলেন অন্ধকারে। একটা শান্ত সুন্দর সংসার—আশা আকাঙ্ক্ষা সাধ স্বপ্নে গড়া জীবনের ছন্দ কেমন করে আস্তে আস্তে তাল কেটে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। কে এর জন্য দায়ী? মৃদুলা? বলা কঠিন। কিন্তু যদি মৃদুলার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অভিনেত্রী হবার সাধ এই ভাঙ্গনের কারণ হয়, সে নিজে তার প্রায়শ্চিত্ত করে গেছে আত্মঘাতিনী হয়ে। আর উজ্জ্বলকুমার? তিনিই যে মৃদুলাকে প্ররোচনা দিয়ে বাইরে এনে ভোগ করতে চেয়েছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর একটা লুকিয়ে রাখা ছবিতে স্পষ্ট। আর অমিয় বকসী? অত গুণী প্রতিভাশালী মানুষ। তিনিও কামার্ত পশুর মতো কন্যাতুল্য কিশোরী অপালাকে নিষ্কৃতি দেননি। ভাবতেও গা ঘিনঘিন করে। এর চেয়ে পাপ আর কিসে? পলাতকা অপালা যখন চন্দ্রা নাম নিয়ে ব্রথেলে আশ্রয় নিয়েছিল, তখনও কত পশু তাকে ছিঁড়ে খেয়ে গেছে। ওই অমর্ত্য রায় তার ভাল হবার সুযোগটুকু নষ্ট করে দিয়েছিলেন স্বপনের কাছ থেকে প্ররোচনায় তাকে ছিনিয়ে নিয়ে। স্বপনকে ভুল বুঝেছেন শিবশংকর। স্বপনের চেষ্টাকে তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি। স্বপনের মধ্যে উদ্ধার করার একটা আকুতি আছে। রাখীর প্রতি তার আচরণ, নন্দিতা নামে আরও একটি মেয়েকে তার উদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা—এ সবই তার প্রমাণ।

রথীন্দ্র আবার ডাকলেন—কর্নেল!

কর্নেল তাঁর কাঁধে হাত রেখে আস্তে বললেন—বলব, বলব বাচ্চুবাবু। সব কথা বলব। আমাকে—প্লিজ একটু—জাস্ট একটু সময় দিন। ওঃ! কি ট্রাজিক, কি মর্মান্তিক এই রহস্যময় কেসের পরিণতি! কেন যে আমার এখনও শিক্ষা হল না, আবার জড়াতে গেলুম নিজেকে। ওক্কে ডার্লিং! নাও আই অ্যাম অলরাইট।

কর্নেল জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন।......

স্টুডিও বিল্ডিংয়ের দিকটা ঘন অন্ধকারে ঢাকা। অন্ধকার বাগান, পুকুর, পার্ক, জঙ্গল জুড়ে। পুকুরের পূর্ব পাড়ে ঘন ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন ইলেকট্রিশিয়ান শিবশংকর গুপ্ত। দক্ষিণে বাঁধানো ঘাট আছে। কত ছবির স্যুটিং হয় সেখানে। এখন নিঝুম অন্ধকারে ঢাকা। শনশন করে বাতাস বইছে গ্রীষ্মের রাতে। ঘাটের মাথায় গিয়ে বসলেন। পুকুরের জলে শাপলার পাতা কাঁপছে। নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব ঝিকমিক করছে জলের ভাঁজে। ভেঙে যাচ্ছে, নিভছে, ভেসে উঠছে। শিবশংকরের বুকের ভেতর থেকে কি একটা ঠেলে উঠছে বারবার। আস্তে নাক ঝেড়ে ময়লামাথা শার্টের হাতায় নাক ঘষলেন। তাকিয়ে রইলেন নক্ষত্রভরা জলের দিকে। অপালার কচি মুখটা ভেসে উঠছে কেন যে এখন! শিবশংকর দুঃখিত দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে মনে মনে বললেন—মা অপু, তোর আত্মার শান্তি হবে বলে। আর কিছুর জন্য না। তুই শান্তি পাবি বলে যত কিছু! আমার আর কি? বুড়ো হয়ে গেছি। শরীরটা কোনরকমে টিঁকিয়ে রেখেছিলুম শুধু তোর ফ্যাকাসে রোগা মুখখানার দিকে তাকিয়ে। নইলে কবে তোর মায়ের মতো—তোর মায়েরও দোষ নেই রে। চিরকাল বোকা—নির্বোধ মেয়েছেলে। যে যা বলে, বিশ্বাস করে। সামনে পিছনে ঠাওর করে না। বোকা বলেই না বজ্জাত উজ্জ্বলের পাল্লায় পড়ে সে আমার কাছ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। ডিভোর্স পর্যন্ত করে বসল। কি? না—আমি অত্যাচার করি ওর ওপর। তখন উজ্জ্বল নামকরা হিরো। তার কথায় মিথ্যা সাক্ষী দিল শুয়োরের বাচ্চা অমিয় বকসী। উজ্জ্বল তো দেবেই সাক্ষী। ডিভোর্স হয়ে গেল। ধন্য বিচার। তারপর কি হল, তুই তো দেখেছিস মা। তখন তুই এগারো বছরের মেয়ে। দেখলি তো তোর মা কি বিপদে পড়ে গেল? উজ্জ্বলের ধাপ্পা কি বুঝতে পারলে? সিনেমায় কে অমন বোকা মেয়েকে চান্স দেবে? দিলেই বা কি হবে? আমি তো জানি ওর অ্যাকটিংয়ের দৌড়! অমিয়র কাঁধে চাপা ছাড়া আর উপায় ছিল না, বুঝলি তো? হুঁ, অমিয়র নাম শুনলে তোর ঘেন্না হয় আমি জানি! থাক—বলব না। অমিয় নরক দেখতে চাইছিল, দেখিয়ে দিয়েছি। উজ্জ্বলকেও নরকে পাঠিয়ে দিয়েছি। তুই শান্ত হ মা। অনেক দুঃখ, অনেক যন্ত্রণা, কষ্টের আগুনে দগ্ধে মরেছিস! বাঁচতে চেয়ে অমিয়র কাছ থেকে পালিয়েছিলি—কিন্তু এ পৃথিবী যে তোর মতো অসহায় মেয়ের প্রতি নিষ্ঠুর। চারদিকে রাক্ষস পিল

পিল করে বেড়াচ্ছে। তারা তোকে বাঁচতে দিলে না। তোকে তারা ছিঁড়ে খেতে লাগল। উজ্জ্বলের জায়গায় এসে দাঁড়াল তার হারামজাদা ছেলে স্বপনটা। আর ওই অমর্ত্য নামে এক কুকুর! তাকেও নরকে পাঠিয়ে দিয়েছি। বাকি রইল স্বপন ছোকরা। তাকেও নরকে পাঠিয়ে দিচ্ছিলুম। বেকায়দায় পড়ে পারা গেল না। আর তু একটা দিন অপেক্ষা কর্! মা অপালা! তোর কোনো দোষ নেই। তোর মায়েরও কোনো দোষ নেই। পৃথিবীটাই যে পাপে ভরে গেছে। তুই কি করবি—তোর মা'ই বা কি করবে?

ফোঁস ফোঁস নাক ঝেড়ে শার্টের হাতায় নাক ঘষলেন আবার। বুকের ভেতর সেই জিনিসটা ঠেলে আসল। ঢোক গিলে তাকালেন জলে প্রতিবিম্বিত নক্ষত্রকণায় ফুটে ওঠা কচি নিষ্পাপ মুখখানির দিকে। চোখ জলে ভরে গেল। গাল বেয়ে শব্দহীন কান্নার স্রোত গড়িয়ে যেতে থাকল।···মা, তোর জন্য রোজ এক বোতল রক্ত নিয়ে রোজিদের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থেকেছি। আমাকে ভেতরে ঢুকতে দেয়নি। আমি তোকে বাঁচিয়ে রাখতে পারতুম রক্ত দিয়ে। যা রোজগার করেছি, সব খরচ করতুম তোর জন্য। তোর চিকিৎসা করতুম ভাল ডাক্তারের কাছে। তোকে ওই রাক্ষসের পুরী থেকে উদ্ধার করতে পারলুম না। ভাবিস না, আমি কাউকে ছাড়ব না। স্বপন, তারপর রোজি হারামজাদী, তারপর ওদের বাড়ির সেই সায়েবটা, তারপর···হুঁ। এর বেশী আর পারব না। তুই শান্ত'হ মা! তুই আমার কত আদরের মেয়ে। তোর কচি মুখের সেই গন্ধটা এখনও ভুলিনি। এখনও পাচ্ছি। ছোটবেলার মতো আরেকটা হামি দে তো মা!

ডুকরে কেঁদে উঠেই সংযত হলেন শিবশংকর। চারদিকে তাকালেন। অন্ধকারে গাছপালার শব্দ হচ্ছে। কাঁধের ব্যাগে হাত ভরে হাতুড়ির বাঁটটা শক্ত করে চেপে ধরলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। ব্যাগে টর্চ আছে। কিন্তু এই এক মাসে মায়াপুরী স্টুডিওর প্রতিটি ইঞ্চি চেনা হয়ে গেছে। অন্ধকারে নির্ভুল পা ফেলে হাঁটতে অসুবিধে হয় না।

রাতে আজকাল স্টুডিওতে স্যুটিং কেউ করতে চায় না! নিঝুম হয়ে থাকে পরিবেশ। আতঙ্কে কেউ সন্ধ্যার পর ফ্লোর এলাকা ছেড়ে বাইরে পা বাড়ায় না। শিবশংকর সাবধানে হেঁটে লম্বা বাড়িটার শেষ প্রান্তে নিচু তলায় তাঁর ঘরের সামনে পৌঁছুলেন। দরজার সামনে এসে তালা খুলতে গিয়ে

সতর্কভাবে টর্চ জ্বাললেন। এখন তাঁর মেদিনীপুরের গ্রামে থাকার কথা রাতটা কাটিয়ে ভোরে বেরিয়ে পড়বেন চুপিচুপি পূবদিকের পাঁচিল ডিঙিয়ে অবস্থা বুঝে আত্মপ্রকাশ করবেন।

কিন্তু দরজা হাট করে খোলা। তালাটা কড়াসুদ্ধ ওপড়ানো। ভেতরে বিছানাটা ওল্টানো। সঙ্গে সঙ্গে টর্চ নিভিয়ে দিলেন। তাহলে কি পুলিস সব টের পেয়ে গেছে? কি ভাবে টের পেল? এ তো অসম্ভব ব্যাপার।

এদিক ওদিক দরজার বাইরে তাকিয়ে দেখে ঘরে ঢুকে বালিশের ভেতর খাতাটা খুঁজলেন। নেই। সারা শরীর হিম হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। মাথা ঘুরতে লাগল।

আর থাকলেন না ভেতরে। বেরিয়ে এলেন। মাথা টলমল করছে নক্ষত্রের আকাশেও যেন বড় হাওয়া দিচ্ছে আজ রাতে। দুলছে। কাঁপছে আবার ব্যাগে হাত ভরে হাতুড়ির বাঁটটা শক্ত করে ধরলেন। সাহস পাওয়ার জন্য। এই জিনিসটাই তাঁর চরম অবলম্বন। এ দিয়ে নারকীদের শাস্তি দিয়েছেন। এটা তাঁর কাছে শক্তিমান ন্যায়দণ্ড! এটা যতক্ষণ কাছে আছে ততক্ষণ তাঁর সঙ্গে স্বয়ং ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বর, তুমিই জানো, আমি কোনো অন্যায় করছি না। পুবের পাঁচিলের দিকে হাঁটতে থাকলেন হতচকিত শিবশংকর গুপ্ত।...

কর্নেল তখন লালবাজার পুলিস হেডকোয়ার্টারে ডি সি ডি ডি অরিজিৎ লাহিড়ীর ঘরের দরজায় পৌঁছেছেন। সীমন্তকে বেশী রাত হতে পারে বলে নিচের রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছেন। সোজা ঘরে ঢুকতেই অরিজিৎ লাফিয়ে উঠলেন।—কি সর্বনাশ!

কর্নেল হাসলেন।—হ্যাঁ, সর্বনাশই বটে। বলে বসলেন।

অরিজিৎ ঘণ্টা বাজিয়ে কফির হুকুম দিলেন। তারপর জিজ্ঞাসু ভঙ্গিতে তাকালেন কর্নেলের দিকে। কর্নেল একটু হেসেছেন। কিন্তু চেষ্টাকৃত হাসি। মুখে গাম্ভীর্য থমথম করছে। কিছু বলছেন না দেখে অরিজিৎ বললেন—সরলবাবুকে ডেকে এনে একটা স্টেটমেণ্ট নিয়ে আপাততঃ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সরলবাবুর বক্তব্য হল: তাঁর একজন ভাল ইলেকট্রিশিয়ান ছিলেন ক্যারি পিগট নামে। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। থাকতেন ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে। ও মাসে ক্যারি বনবিহারী দাশকে তাঁর কাছে সুপারিশ করেন। কারণ ক্যারি অস্ট্রেলিয়া চলে যাচ্ছেন। সরলবাবু সরল বিশ্বাসে

বনবিহারীকে চাকরি দেন। তারপর তার কাজের পরিচয় পেয়ে খুশি হন। খুব অভিজ্ঞ এবং দক্ষ লোক বনবিহারী। তাকে হাতের কাছে রাখার জন্য মায়াপুরী-স্টুডিওতেই থাকার ব্যবস্থা করে দেন। বাই দা বাই, ক্যারি ছিল রোজি স্মিথের স্বামী! আপনি তার নাম এবং রোজির ঠিকানা নিয়েছিলেন।

কর্নেল আস্তে বললেন—তত কিছু ভেবে নিইনি। স্টুডিও এবং ইলেকট্রিশিয়ান শব্দ দুটো তখন আমাকে পেয়ে বসেছিল। তাই তোমাকে টুকে দিতে বলেছিলুম।

অরিজিৎ উচ্চহাস্য করে বললেন—'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলে পাইতে পার অমূল্য রতন।' যাই হোক, আমি কিন্তু এখনও ভেবে পাচ্ছি না। বনবিহারীর সঙ্গে ক্যারির কিভাবে পরিচয় হল?

—বনবিহারীবাবু প্রায়ই তাঁর মেয়ের জন্য রোজির অর্থাৎ মিসেস মিশেলের বাড়ির সামনে গিয়ে ধর্ণা দিতেন। এভাবেই ক্যারির সঙ্গে আলাপ হয়ে থাকবে।

অরিজিৎ ভুরু কুঁচকে তাকালেন। কিন্তু চোখে বিস্ময়। বললেন—মেয়ের জন্য? কে মেয়ে?

—অপালা ওরফে চন্দ্রা।

—আচ্ছা! বুঝতে পেরেছি। সবটাই এবার পরিষ্কার হয়ে গেছে। বনবিহারীই তাহলে মৃদুলার আগের স্বামী—যার ফটো আমরা উদ্ধার করেছি। নিশ্চয় আসল নাম নয়?

কর্নেল মাথা নাড়লেন। - না। শিবশংকর গুপ্ত।

অরিজিৎ নোট করতে যাচ্ছিলেন। কর্নেল প্যান্টের পকেট থেকে ভাঁজ করা এক্সারসাইজ খাতাটা বের করে বললেন—এটা একটা ডকুমেন্ট। মূল্যবান সাক্ষ্য। তোমরা মায়াপুরীতে বনবিহারীবাবুর ঘর সার্চ করলেই এটা পেয়ে যেতে।

অরিজিৎ ভুল স্বীকার করে বললেন—আসলে মেদিনীপুরের রিপোর্টটা পেয়ে তখন আমরা সরলবাবুর দিকেই দৃষ্টি দিয়েছিলুম।

তারপর দ্রুত পাতা উল্টে কিছুক্ষণ খাতাটা দেখার পর দুঃখিত ভাবে মাথা দুলিয়ে বললেন—স্যাড, ভেরি স্যাড! একেবারে ট্রাজিক ব্যাপার। তবে শিবশংকরবাবুর মোটিফ স্পষ্ট হয়ে গেল।

কফি এল। কফিতে চুমুক দিয়ে কর্নেল বললেন—এবার বেশী গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটার জন্য এসেছি বলি।···অরিজিৎ জিজ্ঞাসু চোখে তাকালে বললেন—সেটা আমার ফাঁদ সম্পর্কে, যে-ফাঁদের কথা তোমাকে বলেছি। তোমরা অবিলম্বে স্বপনের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ তুলে নাও।

অরিজিতের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। একটু ভেবে নিয়ে বললেন—একটু সময় লাগবে, কর্নেল! গভর্মেণ্টের পদ্ধতির কথা আপনি তো জানেন! হ্যাঁ—খুনের চার্জে তাকে আর জড়ানোর প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু তার নামে অন্ততঃ গোটা পাঁচেক নানা ধরনের কেস ঝুলছে। হাঙ্গামা, শাসানো, মারধর করা ইত্যাদি অভিযোগ। স্বীকার করছি, এগুলো পেটি অফেন্স। তাহলেও আইন ইজ আইন। আপনি নিশ্চয় আমাকে বে-আইনি কাজ করতে বলবেন না?

কর্নেল শক্ত মুখে বললেন—বলব। কারণ আইনের জন্য মানুষ নয়। মানুষের জন্যই আইন।

অরিজিৎ অবাক হলেন।—ঠিক বুঝতে পারছি না, কর্নেল!

—স্বপন ছিল আসলে একজন প্রতিশ্রুতিবান ফুটবলার। অমর্ত্য তার কেরিয়ার নষ্ট করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে অকপট প্রকৃতির ছেলে, কিছুটা আদর্শবাদী, সাহসী এবং জেদী। প্রতিক্রিয়ার দরুন প্রচণ্ড ক্ষোভে সে হয়তো কিছু মাত্রা ছাড়া কাজ করে বেড়িয়েছে। কিন্তু সেগুলো কি? অন্যায়ের প্রতিবাদ। অরিজিৎ, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়েই সে ফেঁসে গেছে। তাকে কেসে জড়ানো হয়েছে। আমাদের সমাজটা আজ এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে অন্যায়টাই এখন স্বাভাবিক। কেউ অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে তাকে সমর্থন করা দূরে থাক, অন্যায়কারীর পক্ষ নিয়ে আমরা তাকেই লাঞ্ছিত করি। স্বপন এই মনোবৃত্তির শিকার, অরিজিৎ!

অরিজিৎ হাসবার চেষ্টা করে বললেন—কেমন করে জানলেন? আপনার তদন্তের সূত্রে বুঝি?

—ধর, তাই। আমি চাই, তাকে তোমরা কালই সরকারিভাবে অব্যাহতি দাও। প্রেস কনফারেন্স ডেকে—

বাধা দিয়ে অরিজিৎ বললেন—অসম্ভব কর্নেল। মানে, আপাততঃ অসম্ভব। কেন বলি শুনুন। প্রথম কথা, কোর্টে তার নামে এফ. আই. আর. দাখিল হয়েছে। খুনের কেসের এফ. আই. আর. অবশ্য দু'দিনের মধ্যে প্রত্যাহার

করে শিবশংকরবাবুর নামে নতুন এফ. আই. আর. দাখিল করা হবে। যদিও এতে মামলার জোর কমে যাবে। কারণ বিচারকের মনে ধারণা জন্মাবে যে পুলিস দ্বিধাগ্রস্ত—আসামী বদলাচ্ছে বার বার। এটা গেল প্র্যাকটিক্যাল সমস্যা। এবার আছে টেকনিক্যালিটিজ। তার জন্য সময় লাগবে। কর্নেল, এই হাতটা সামান্য একটা ব্লেড দিয়েই এক সেকেণ্ডে অনেকটা চেরা যায়। কিন্তু ঘা শুকতে সময় লাগে। এবার আসছি, স্বপনের বিরুদ্ধে অন্যান্য পেটি কেস প্রসঙ্গে। আপনি বলবেন, বহু কেস তো পুলিস ধামাচাপা দেয়। হ্যাঁ, দেয়। কিন্তু সেও একটা দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি। কালই আমরা প্রেস কনফারেন্স ডেকে বলতে পারি না যে স্বপন সমস্ত কেসে নির্দোষ! এতে পুলিসের ভেতরকার মরাল কারেজ নষ্ট হয়ে যাবে। যে সব অফিসার ওই কেস দিয়েছেন, তাঁরা মনে মনে আহত হবেন। শুধু তাই নয়, এর সুযোগ বহু ক্ষেত্রে তাঁরা নেবেন এবং পরিণামে দুর্নীতি বেড়ে যাবে। ভেবে দেখুন আপনি!

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন।—অরিজিৎ! তোমরা আমার সহযোগিতা চেয়েছিলে। প্রকৃত খুনীকে খুঁজে বের করতে অনুরোধ করেছিলে। আমি তা করেছি। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার তোমরা আমাকে সহযোগিতা করলে না। ওকে, এই আমার শেষ কেস। তোমাদের সঙ্গে সম্পর্কেরও শেষ। গুড বাই!

অরিজিৎ ব্যস্তভাবে বললেন—কর্নেল! প্লিজ—প্লিজ আপনি বসুন। আপনি উত্তেজিত।

—হ্যাঁ, আমি উত্তেজিত। আমি চেয়েছিলুম শিবশংকরবাবুকে ফাঁদে ফেলতে। এখন দেখ, তোমরা তাঁকে কত দিনে খুঁজে বের করতে পার!

অরিজিৎ উঠে এসে কর্নেলের হাত ধরে বসিয়ে দিলেন চেয়ারে। তারপর বললেন—বেশ তো, সেজন্য অসুবিধে হবে না। স্বপনকে আপাততঃ যতদিন চাইবেন ততদিন অ্যারেস্ট করব না, দেখেও দেখব না।

কর্নেল ক্রুদ্ধভাবে বললেন—তুমি আমাকে স্বপনকে ধোঁকা দিতে বলছ? মিথ্যা বলে তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিই, তাই চাইছ? না অরিজিৎ! তাকে প্রবঞ্চনা করে তোমাদের কাজ উদ্ধার করা অসম্ভব আমার পক্ষে। তার চোখে আমি কত ছোট হয়ে যাব, বুঝতে পারছ না?

অরিজিৎ চিন্তিতমুখে নিজের আসনে গিয়ে বসলেন। কপালে হাত রেখে টেবিলে কনুই ভর করে দু'মিনিট ঝুঁকে থাকার পর মুখ তুললেন। একটু হাসলেন।—মনে হচ্ছে শিবশংকরবাবুকে ফাঁদে ফেলে ধরার চাইতে স্বপনকে ফ্রি করে দেওয়ার প্রতি আপনার আগ্রহ বেশী।

—ভুল করছ! দুটো ব্যাপারই অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে রয়েছে। অথবা একই জিনিসের দুটো দিক। দুটোকে আলাদা করা যায় না।

—আচ্ছা, ধরুন স্বপনকে আমরা সব কেস থেকে অব্যাহতি দিলুম। তারপর—মানে, আপনার সেই ফাঁদটার কথা বলছি।

—তারপর তুমি অবিলম্বে ইলেভেন টাইগার্স ক্লাবের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলবে। ওঁদের অনুরোধ করবে স্বপনকে আবার ক্লাবে খেলোয়াড় হিসেবে নিতে। আশাকরি, ওঁদের অমত হবে না। অমর্ত্য বেঁচে নেই। আমি পুরোনো কাগজ ঘেঁটে দেখেছি, স্বপন ছিল ওঁদের দলের সেরা খেলোয়াড়। ওঁরা যদি জানতে চান কেন তোমার এতে এত আগ্রহ, তুমি বলবে—আমি স্বপনের ফ্যান ছিলুম। তা ছাড়া ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতেই স্বপনকে তুমি রি-এস্টাব্লিস করতে চাইছ।

—ওকে, ওকে! বুঝেছি। তারপর স্বপন নিয়মিত মাঠে যাবে। খেলবে। কিন্তু ফাঁদটা কোথায়!

—অরিজিৎ, শিবশংকরের আরেক টার্গেট স্বপন। তিনি তাকে খুনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। স্বপন জখম হয়েছে।

—অদ্ভুত! কিন্তু কোথায় সে?

—আছে। তবে আশাকরি বুঝতে পেরেছ কেন সে টার্গেট?

—হ্যাঁ। অপালা বা চন্দ্রার প্রেমিক ছিল সে।

—তা নয়। শিবশংকরের ধারণা হয়ে থাকবে যে যারা তাঁর মেয়ের সর্বনাশ করেছে, স্বপনও তাদের একজন। তা না হলে স্বপনকে তিনি খুনের চেষ্টা করতেন না। সব কথা যথাসময়ে বলব তোমাকে।

অরিজিৎ গম্ভীর হলেন ফের।—ঠিক আছে। আমি কমিশনার সায়েবের সঙ্গে আলোচনা করে আপনাকে জানাচ্ছি। এখন তো ওঁকে পাওয়া যাবে না। কাল সকালেই কথা বলে আপনার কাছে যাব। আশাকরি আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে পারব। হি ইজ এ ভেরি সেন্সিব্‌ল্ ম্যান। আপনার গুণমুগ্ধ ভক্তও!

কর্নেল উঠলেন। বললেন—সাড়ে দশটা বাজে। ট্যাক্সি পাব কি না কে জানে। না হলে ট্রাম।

অরিজিৎ উঠে দাঁড়ালেন।—গাড়ি আনেননি? এতক্ষণ বলবেন তো! চলুন, আমিও বেরোই। আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাব।···

শিবশংকর উত্তর কলকাতার একটা গলিতে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছেন। লম্বা মানুষ। রোগা গড়ন। খাড়া নাক। কাঁচা পাকা ছোট-ছোট চুল। একটুখানি গোঁফ রাখেন। কিন্তু দু'দিন ধরে কামানো হয়নি। খোঁচা খোঁচা সাদা গোঁফদাড়িতে মুখ ভরে গেছে। গলি প্রায় নির্জন। হলুদে আলোয় দুধারের জীর্ণ বাড়িগুলো দাঁত বের করে আছে। রাত সাড়ে দশটায় পাড়াটা নিশুতি হয়ে গেছে। দু'পাশে তাকাতে তাকাতে হাঁটছেন। মাঝে মাঝে পেছনে তাকিয়ে নিচ্ছেন। কত বছর পরে এই গলিতে ঢুকেছেন আবার। একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। দরজায় একটি কিশোরী দাঁড়িয়ে আছে। কলে জল ভরতে দিয়ে অপেক্ষা করছে। জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ মা, এখানে কিরণময়ী নামে একজন থাকত। এখন কি থাকে বলতে পার? দাঁড়াও—কিরণের নাম বললে চিনতে নাও পার। নবগোপাল!

কিশোরীটি গম্ভীর মুখে বলল—আমার বাবা।

শিবশংকর হাত বাড়িয়ে তার মাথা ছুঁলেন।—ও আমার মা গো! তুমি কিরণের মেয়ে? আহা হা!

কিশোরী মাথা সরিয়ে নিল বিব্রত ভাবে। শিবশংকর ঢুকে গেলেন ভেতরে। ডাকলেন—কিরণ! কিরণ কৈ গো? আমি শিবুদা!

বিধবা এক প্রৌঢ়া ছোট্ট উঠোনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। অবাক চাউনি। একটু পরে হেসে ফেললেন।—শিবুদা! এত রাত্রে কোত্থেকে তুমি? এস এস। ইশ! তোমাকে চেনাই যাচ্ছে না যে গো! অসুখ হয়েছিল নাকি?

শিবশংকর হাসলেন।—কত বছর পরে এলুম বল তো কিরণ? আসাই হয় না। বলে এতক্ষণে চোখ গেল কিরণময়ীর সাদা থানের দিকে।—আঃ হা! কবে কপাল ভাঙলি বোন? কি হয়েছিল নবগোপালের? আহা রে!

কিরণময়ী শ্বাস ছেড়ে আস্তে বললেন—দাঁড়িয়ে কেন শিবুদা? ভেতরে এসে বস।···



॥ এগারো ॥

বিকেলে কর্নেল ছাদে গেছেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃতিজগতে ঢুকতে পারছেন না—মনে অস্থিরতা। সারাটা দিন প্রতীক্ষায় কেটে গেল। অরিজিৎ এলেন না। ওঁর দোষ নেই। প্রশাসনের হালচালই এই। ঘরে আগুন লেগেছে—ফাইলে নোট পাঠিয়ে এ-টেবিল থেকে সে-টেবিল ঘুরে কর্তার কাছে এবং কর্তার কাছ থেকে ফিরতে ফিরতে সব পুড়ে ছাই। কর্তা এক বছর ধরে লিখেছেন, দমকল ডাকো।...হুঁ, এই হল অবস্থা। নিজেদের জীবনে, কাজকর্মে এতটুকু আইন মানার তাগিদ নেই। অন্যের বেলা চুলচেরা হিসেব করে আইন মানা হয়েছে কিনা সেই নিয়ে গবেষকদেরও হার মানানোর চূড়ান্ত নজির।

পাঁচটায় ষষ্ঠী দৌড়ে এল ছাদে। নালবাজারের নাহিড়িসায়েব, বাবামশাই।

—স্বপন কোথায়?

—ডাইনিং ঘরে 'টি-ভি' দেখছেন দাদাবাবু! আজ ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের খেলা না?

—হুঁ, 'টি-ভি' বন্ধ করতে বলিসনি?

—না তো! বলছি গিয়ে। ষষ্ঠী পা বাড়াল।

কর্নেল ধমক দিয়ে বললেন—থাম হতচ্ছাড়া। দৌড়োস নে বুনো গাধার মতো।

ষষ্ঠী পেছনে নামতে নামতে বলল—গাধাও কি বুনো হয় বাবামশাই?

—হয়। কচ্ছ এলাকার রানে বুনো গাধা আছে। তোর মতো দৌড়ায়।

কর্নেল ড্রয়িংরুমে ঢুকে লক্ষ্য করলেন অরিজিৎ মিটিমিটি হাসছেন। বললেন—আজ সারাদিন আপনার জন্য ঘোরাঘুরি করে ভীষণ টায়ার্ড। তবে শেষ

পর্যন্ত আপনাকে খুশি করতে পেরেছি। এভরিথিং ওকে। সন্ধ্যা ছ'টায় কমিশনার সায়েব প্রেস কনফারেন্স ডেকেছেন। কাজেই বেশীক্ষণ বসব না।

—ইলেভেন টাইগার্সের কর্মকর্তারা কি বললেন?

—অধিকাংশের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা রাজি। কেউ কেউ খুবই রাজি। তাঁরা স্বপনের প্রচণ্ড ফ্যান। অমর্ত্যের জন্য মুখ খোলেননি এতকাল। তবে একটু দেরি হবে। মানে দু'তিনটে দিন। বিশেষ জরুরী মিটিং ডেকে স্বপনের ব্যাপারে একটা ফর্ম্যাল প্রস্তাব পাস করানোর ওয়াস্তা শুধু। অবশ্য স্বপন ইচ্ছে করলে কাল থেকে ক্লাবে যেতে পারে। এতে কারুর আপত্তি নেই। আর ফুটবল ফেডারেশনে অমর্ত্যবাবু স্বপনের নামে যে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রেখে গেছেন, সেটার জন্যও ক্লাব মুভ করবে। তারপর সব খেলাতেই স্বপনের যোগ দিতে আর বাধা থাকবে না।—আই মিন, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খেলায়।

—অসংখ্য ধন্যবাদ, ডার্লিং! কি বলে যে তোমাকে—

কর্নেলের গলা ধরে এল। স্বপনের জন্য বৃদ্ধের এত ভাবাবেগ কেন? অরিজিৎ চোখে ঝিলিক তুলে বললেন—টি-ভির সোরগোল শুনছি আসা অব্দি। আজ বড় খেলা আছে। কে টি-ভি দেখছে কর্নেল?

—আবার কে? ষষ্ঠী। কর্নেল হাসলেন।—ও আবার মোহনবাগানের সাপোর্টার।

অরিজিৎ উচ্চহাস্য করে বললেন—কর্নেল। আমি ডিটেকটিভ ডিপার্টের লোক। তা ছাড়া আপনার সঙ্গ গুণে আমিও ডিটেকটিভ পদ্ধতি ফলো করতে অভ্যস্ত হয়েছি। স্বপনকে ডাকুন। আলাপ করে যাই।

কর্নেল হাসিতে গলা মেলালেন। তারপর উঠে গিয়ে স্বপনকে ডেকে নিয়ে এলেন—আলাপ করিয়ে দিই। ডি সি ডি ডি অরিজিৎ লাহিড়ী। এখন তোমার হিতৈষী বন্ধু।

অরিজিৎ হাত বাড়িয়ে বললেন—আসুন স্বপনবাবু! এখন আপনি একজন মুক্ত মানুষ। কাজেই সংকোচের কারণ নেই। আমার পাশে বসুন।

স্বপন বসল। মুখে উদ্বেগের ছাপ। কর্নেল বললেন—কাল থেকে তুমি আবার মাঠে যাচ্ছ। ইলেভেন টাইগার্সের অন্যতম টাইগার হয়ে উঠতে জাস্ট দু'তিনটে দিন। নতুন করে জীবন শুরু.কর, ডার্লিং!

স্বপন তাকাল। সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। অরিজিৎ তার কাঁধে হাত রেখে বললেন—হ্যাঁ, স্বপনবাবু! আমরা আপনার নামে সব কেস

উইথড্র করছি। কালকের কাগজে দেখতে পাবেন। শুধু একটাই অনুরোধ আপনার কাছে—কর্নেলের এবং আমার মুখ যেন রাখবেন ভাইটি। আপনি ছিলেন প্রমিজিং প্লেয়ার। আমরা দেখতে চাই, আপনি দেশের একজন শ্রেষ্ঠ ফুটবলার হয়েছেন। আপনাকে যাতে সবরকমের সাহায্য দেওয়া হয়, আমি সেদিকে লক্ষ্য রাখব। মনপ্রাণ দিয়ে আবার প্র্যাকটিস শুরু করুন দু'বেলা। ওঁদের নতুন কোচ আসছেন দিলীপ দেশাই। আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান কোচ।

স্বপনের ঠোঁট কাঁপছিল। প্রচণ্ড আবেগে তার চোখ ছলছল করে উঠেছিল। হঠাৎ সে দু'হাতে মুখ ঢেকে ঝুঁকে পড়ল। সামলাতে পারল না নিজেকে। কর্নেল তার পিঠে হাত রাখলেন।

অরিজিৎ বললেন—আমি উঠি, কর্নেল! ছ'টায় প্রেসকনফারেন্স সি. পি.-র ঘরে! আমাকেও থাকতে হবে। স্বপনবাবু, উইশ ইউ গুড লাক!···

দশটা বছর ধরে একটু একটু করে যে দুঃখ, লোভ, আর ব্যর্থ ক্রোধ মনের মধ্যে জমে উঠেছিল, শিবশংকর হঠাৎ একদিন টের পেয়েছিলেন, তার প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটতে চলেছে? তখন যদি হাতের হাতুড়িটার দিকে ঘুরে না তাকাতেন, সেই বিস্ফোরণের চাপে তিনি নিজেই শেষ হয়ে যেতেন। হাতুড়িটা মুঠোয় ধরে তিনি ভেবেছিলেন, এই মুহূর্তে একটা কিছু করার সময় হয়েছে। নিজেকে বাঁচানোর জন্যই।

আসলে তাঁর মানসিক প্রকৃতিতে চিরাচরিত আলস্যের গড়িমসি, ঝটপট কোনো সিদ্ধান্ত করতে পারেন না—তাঁর হাঁটাচলা, তাঁর কথা বলা এবং তাঁর শারীরিক ভঙ্গিমার মতোই এক বহুব্যাপক শৈথিল্য ও দীর্ঘসূত্রিতার করায়ত্ত তিনি। আদালতে যেদিন মৃদুলার সঙ্গে তাঁর চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটে গেল, সেদিন তিনি বারান্দায় চুপচাপ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাঁর উকিল এসে বললেন—'মেয়ে আপনার কাছে থাকতে চায়, অথচ তার মা তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। আপনি আটকান মেয়েকে। আইনতঃ আপনিই মেয়েকে কাছে রাখতে পারেন। চলুন!'

শিবশংকর শুধু চোখে চোখে তাকিয়ে রইলেন। কি বলবেন ভেবেই পেলেন না। একটু পরে আস্তে আস্তে হেঁটে রাস্তায় নামলেন। এখনও মনে পড়ে, হঠাৎ কি একটা মুক্তির হাওয়া এসে ঝাপটা মেরেছিল তাঁকে। আর তাঁকে স্ত্রীর পেছনে গোয়েন্দাগিরি করতে হবে না। অপালাকেও নষ্ট করে

ফেলবে এই ভয়ে সব সময় তাকে আগলে রাখতে হবে না। ঝগড়াঝাঁটি হবে না। ভরণপোষণের দায়দায়িত্ব বইতে হবে না। যেখানে খুশি নিরুদ্বেগে ঘুরে বেড়াতে পারবেন। সত্যিই তো এ এক বিরাট মুক্তি!

অথচ মুক্তি পেলেন কই? মৃত্নলা বলতেন—'খালি কুচুটে স্বভাব। ছোঁক ছোঁক করে অন্যের পেছনে আড়ালে আড়ালে ঘুরে বেড়ানো—গোয়েন্দাগিরি। কোথায় পাপ? যত পাপ তো তোমার নিজের চোখে। আর খালি খুঁচিয়ে ঘা করার অভ্যাস। নিজের জ্বালায় নিজেই জ্বলে মরছ তুমি! আগে নিজেকে শুদ্ধ কর। তারপর অন্যকে শুদ্ধ করতে এস। ঠিক তাও নয়। শিবশংকর এখন বুঝতে পারেন, তাঁকে ঈশ্বর যেন এমন একটা দৃষ্টি দিয়েছেন জন্মকাল থেকে, যা তাঁকে খারাপ জিনিসগুলোকেই বেশী করে দেখিয়ে দেয়। অন্য মানুষের এই দৃষ্টি শক্তিটা নেই। তারা ভাল খারাপের পার্থক্য তাই করতে পারে না। শিবশংকর মুক্তি পেয়েও তাই নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। মৃত্নলা আরও কতটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে এবং মেয়েকেও কতখানি খারাপের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তা দেখার জন্য ছটফট করেছিলেন।

অমিয় বক্সী তখন থাকতেন শ্যামবাজারে। মৃত্নলাকে তিনি বিয়ে করলেন —মৃত্নলারও একটা আশ্রয় দরকার ছিল। কোথায় দাঁড়াবে নির্বোধ স্ত্রীলোক? ওদের বাড়ির পাশেই একটা ছোট বাল্ব তৈরির কারখানায় কাজ যোগাড় করেছিলেন শিবশংকর। দোতলা কারখানা বাড়িটার ওপরের জানলা থেকে নিচে অমিয়র জানলা চোখে পড়ত। ছোট একটা বাইনোকুলার কিনে এনেছিলেন শিবশংকর! চোখে রেখে খুঁটিয়ে কীর্তিকলাপ দেখতেন। দুঃখে, ক্ষোভে, রাগে ছটফট করতেন। কিন্তু কিই বা করতে পারেন? তিনি সামান্য মিস্তিরি মানুষ। অমিয় বক্সী সুশিক্ষিত ভদ্রলোক। পাড়ায় তাঁর সম্মান। সদ্য সিনেমা করে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠেছেন অমিয়। কি করতে পারতেন ইলেকট্রিক মিস্তিরি?

আঃ! তখনও তাঁর হাতে হাতুড়ি ছিল। অথচ তাঁর অস্তিত্বটাই যেন নিঃসাড় হয়ে গিয়েছিল। টের পেতেন না করুণাময় ঈশ্বর তাঁর হাতেই পাপীদের বিচারের জন্য একটি ন্যায়দণ্ড তুলে দিয়েছেন। সাতটা বছর কি অদ্ভুত অবচেতন, নিষ্ক্রিয় আর আলস্যজড়িত জীবনধারণ করেছেন শিবশংকর! প্রতি মুহূর্তে বিষের জ্বালায় জ্বলেছেন। আর প্রতি মুহূর্তে খালি মনে হয়েছে তিনি এত অসহায়, এত দুর্বল!

হুঁ, অপালা পালিয়ে গেল খুব আনন্দ হয়েছিল—যেমন আনন্দ হয়েছিল মৃদুলার মৃতদেহ মর্গে নিয়ে যাওয়া দেখে! মায়ের আত্মহত্যার পর অপালার না পালিয়ে উপায় ছিল না। জানোয়ারটা তখন তাকে নির্বিবাদে একা পেয়ে গিয়েছিল। অস্থির শিবশংকর একবার অমিয়র ঘরের দরজায় পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু আর সাহস পাননি। পাছে তাঁকে চোর ভেবে লোকেরা তাড়া করে, তাই পালিয়ে এসেছিলেন। ভেতরে অপালার কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এখনও কথাটা মনে পড়লে নিজেকে গাল দিয়ে বলেন, —ধিক শিবু! শত ধিক তোকে! তুই না বাপ? অমন করে নিজের প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এলি! তোর মরণ হয় না রে হতচ্ছাড়া?

না, মরণ হয়নি, নিজেকে অক্ষমতার দায়ে দায়ী করে মেরে ফেলেননি বলেই তো পাপীদের পাপের চরম দণ্ড দিতে পেরেছেন শিবশংকর। তিনি মরতেন, আর ওই নারকীরা বেঁচে থাকত—আরও কতজনের সর্বনাশ করত, এ কি হয়? হিন্দুসংকার সমিতির গাড়িতে করে যেদিন অপালাকে নিয়ে যাচ্ছিল, সেদিন তিনি হাসপাতালের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে। ক্যারি সায়েব অপালাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার খবরটা দিয়েছিল। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ভাবছেন, অপালার কাছে তাঁকে যেতে দেবে তো? সেই সময় সংকার সমিতির গাড়িটা বেরিয়ে গেল। স্বপনকে যেতে দেখেই বুঝলেন, অপালা বাঁচল এতদিনে।

আনমনে সেই মুহূর্তে কাঁধের ঝুলন্ত কিটব্যাগের ভেতর হাতটা নিজের অজান্তে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন—হয়তো একটা কিছু আঁকড়ে ধরতে চাইছিলেন। হাতুড়ির হাতলে হাত পড়তেই মুঠো করে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে যেন বিদ্যুতের শক লাগল। শিউরে উঠলেন। মুঠো শক্ত হয়ে গেল। হা ঈশ্বর! এই তো ন্যায়দণ্ড দিয়েছ শিবু মিস্তিরিকে! কবে থেকে দিয়ে রেখেছ—বোকা, গোঁফখেজুরে, ভিতুর শিরোমণি শিবু এই মর্মই বুঝতে পারেনি।

শিবশংকরের শরীর শক্ত হয়ে গিয়েছিল। ঠোঁট কামড়ে ধরেছিলেন। চোখ দুটো জন্তুর মতো নিষ্পলক নীল হয়ে গিয়েছিল। ওই শিবু! কাজে লেগে যাও! ঈশ্বর তোমার দিকে তাকিয়ে আছেন, দেখছেন তুমি কি কর ···

কিরণময়ী ডাকছিলেন—শিবুদা! ও শিবুদা!

শিবশংকর ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

কিরণময়ী একটু হেসে বললেন—ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করছিলে দেখে ডাকলুম। শোবে তো শোও। মোটে পাঁচটা বাজে।

শিবশংকর আড়মোড়া দিলেন।—আমি চারটে সাড়ে-চারটেতে উঠে পড়ি। আর শোব না। দেখ, একটু চা দিতে পারিস নাকি।

—কেটলি বসিয়েছি। আমি তো ছ'টার আগেই উঠে পড়ি। ওরা সব সাতটার আগে ওঠে না।

শিবশংকর বাথরুমে গেলেন। মুখোমুখি দেড়খানা করে ঘর, মধ্যিখানে উঠোন। দুটো পরিবার থাকে। উল্টোদিকের পরিবারটি নতুন ভাড়াটে। স্বামী আর স্ত্রী। সদ্য বিয়ে হয়েছে। গতকালও দেখেছেন ওরা বেলা করে ওঠে। উঠবেই তো! নতুন জীবন-যৌবন। প্রাণভরে স্বাদ নিচ্ছে। ঈশ্বর মানুষকে স্বাভাবিক ও ন্যায়সম্মত কত সুখ দিয়ে রেখেছেন। কত সামাজিক আনন্দের উপকরণ মানুষের জীবন! তবু মানুষ কেন পাপের ডাকে অস্বাভাবিক ও অন্যায় আনন্দ কুড়িয়ে নিতে ছুটে যায়। নিজের ক্ষতি করে, অন্যেরও ক্ষতি করে।

বাথরুমের কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়াতেই ঘুলঘুলি চোখে পড়ল। এই এক অভ্যাস। পেছনে খাটাল। খাটিয়ায় একটি স্ত্রীলোক শুয়ে আছে। খোলা স্তনে গাল রেখে ঘুমোচ্ছে একটি শিশু। আহা রে! কি স্বর্গীয় দৃশ্য! তারিয়ে তারিয়ে দেখতে থাকলেন। তার মরদ চা আনতে গিয়েছিল। এসে ওঠাল বউকে। হৈ! উঠ্! উঠ্! উঠ্ যা! চায় লেইলা বা।

খোলা আকাশের নিচে জীবনের অনাবিল আনন্দ! শিবু তুইও তো তাই চেয়েছিলি। এর একটুও কম বেশি নয়। এইটুকুই। তোকে তা পেতে দেয়নি। আঃ! শিবশংকর নাক ঝাড়লেন! হাতমাটি করে বেরিয়ে এসে এক মগ জল চাইলেন কিরণময়ীকে।—পরে দাঁত ব্রাশ করব। কুলকুচো করে ধুয়ে নিই মুখটা। কি বলিস কিরণ? সপ্তাটাক ছুটি নিয়েছি একটু অনিয়ম করি। সারাটা জীবন তো নিয়ম করে কাটালুম।

কিরণময়ী হাসলেন।—আজ তোমায় একটু ফ্রেশ দেখাচ্ছে শিবুদা!

—বলছিস?

—কিন্তু দাড়িটা কি রেখে দেবে ভাবছ?

—থাক না। বুড়োদের দাড়ি রাখা ভাল। চুলও থাক। খাঁটি সাধু-সন্ন্যাসী তো হওয়া গেল না, নকল হই।

চা খেতে খেতে কিরণময়ী বললেন—আজ তুমি বাজার করবে শিবুদা। কাল তো দেখলে, নন্টু অতগুলো টাকায় কি এনে দিলে! ছেলেমানুষ পেয়ে রোজ ওকে ঠকায়। কি করব? আমি ওসব পারি না যে।

শিবশংকর একটু হেসে বললেন—আমিও যে তাই। বুঝলে না? প্রায় সারা জীবন হোটেলে খেয়ে কাটাচ্ছি। ওই যা শুধু দশ বারোটা বছর। তাও বেশির ভাগ দিন হোটেলেই খেতে হয়েছে। তোমার বউদিকে তো মনে আছে। থিয়েটার আর সিনেমা নিয়েই—। আজ একবার ভাবছি ব্রজদাকে দেখতে যাব। চা খেয়েই না হয় বেরিয়ে পড়ি। নইলে অফিসে বেরিয়ে যাবে।

—ব্রজদার নতুন ঠিকানা জান—যাবে যে?

—সে বাসায় নেই বুঝি?

—না। গড়পারের ওদিকে যেন কোথায় থাকে এখন।

—সে আমি খুঁজে বের করব। গড়পার রোডে আমার অফিসের একজন থাকে।

বাজার করতে বলে বড় বিপদে ফেলেছে কিরণ। পরশু রাতে এসেছেন। কাল দিনমান শুয়ে কাটিয়েছেন। আজ একবার বেরুতেই হবে। এখন অবশ্য রাস্তায় লোকজন কম। কোথাও নিরিবিলি বসে থাকবেন—বলে এলেন, দুপুরে বাইরে খেয়ে নেবেন। গলিটা পেরিয়েই বড় রাস্তার বাসস্টপ। ছ'টা বেজেছে। বাস আসতেই উঠে পড়লেন। কাঁধে ব্যাগটা নিতে ভোলেন নি! বলা যায় না, কখন কি ঘটে যায়।

বাসে সকালের শিফটের কারখানাকর্মীদের সামান্য ভিড়। কিছু স্কুলের দিদিমণি, খোকাখুকুরা। চোখ ভরে দেখতে দেখতে গেলেন শিবশংকর। মনে মনে বললেন, বেঁচেবর্তে থাক সব। ভাল থাক। পাপ যেন তোমাদের ছুঁতে পারে না। একটা বাচ্চার হাত ধরে আদরও করলেন। বাচ্চাটা মায়ের শরীরে মিশে গিয়ে প্যাট প্যাট করে তাঁকে দেখতে থাকল।

এসপ্ল্যানেডে এসে তড়াক করে উঠে নেমে এলেন শিবশংকর। এখনও বিশেষ লোকজন নেই। অসংখ্য হকার খবরের কাগজ গোছাচ্ছে মোড়ের ওধারে। একটা দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা কিনে ব্যাগে ঢুকিয়ে হাঁটতে

থাকলেন হনহনিয়ে। গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে থাকবেন। আঃ। কতকাল গঙ্গাদর্শন হয়নি!

সতর্কতা সব সময় তাঁর চোখের কোণায় তৈরী। তবে তাঁর একটা বড় সুবিধে, খুব কম লোক তাঁকে চেনে। জীবনে মুখচোরা স্বভাবের জন্য বিশেষ মেলামেশা করেননি বড় একটা। তবে যারা তাঁকে চেনে, তাদের নিয়ে মাথাব্যথা নেই—যতক্ষণ না কাগজে তাঁর নামে কিছু বেরোচ্ছে। তিনি নিশ্চিন্ত যে পুলিস তাঁকে দেখলে চিনতে পারবে না। তাঁর কোনো ছবি ওরা পাবে কোথায়? বহু আগে দুই একটা তুলিয়েছিলেন। কোথায় নষ্ট হয়ে গেছে তাঁর সংসারের ধ্বংসস্তূপে।

হুঁ। এক যদি স্টুডিও মহলের কেউ দেখে ফেলে। তবে তার চান্স একেবারে কম। দেখলেই তো আর তারা তাঁকে চেপে ধরে 'পুলিস! পুলিস!' বলে চেঁচাবেন না! পালিয়ে যাবার সময় যথেষ্ট পাবেন।

গঙ্গার ধারে একটা বেঞ্চে বসে কাগজটা খুললেন শিবশংকর। খুলেই একটু চমকে উঠলেন। প্রথম পাতায় বক্স করে বোল্ড টাইপে খবর, পাশে স্বপনের প্রোফাইল।

ফুটবলার মুক্ত

স্টাফ রিপোর্টার—ইলেভেন টাইগার্সের প্রাক্তন ফুটবলার স্বপন অধিকারীর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ পুলিস প্রত্যাহার করে নিয়েছে। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিস কমিশনার এই খবর দিয়ে জানান, স্বপনকে ভুলক্রমে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। সে একজন প্রতিশ্রুতিবান ফুটবলার। তার খেলোয়াড় জীবনে ঘটনাচক্রে এবং কোনো-কোনো স্বার্থান্বেষী মহলের চক্রান্তে এক বছর ছেদ পড়েছিল। কমিশনার এজন্য দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আশাকরি, অভিযোগ মুক্ত স্বপন আবার ফুটবলের জগতে ফিরে যাবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সাংবাদিক সম্মেলনের পর গভীর রাত্রে আমরা একটি গোপন স্থানে স্বপনের সাক্ষাৎকার নিতে যাই। স্বপন বলেন, তিনি তাঁর পুরনো দলেই ফিরে যেতে ইচ্ছুক। তবে সেটা নির্ভর করছে ক্লাবের কর্মকর্তাদের ওপর। আগামীকালই তিনি তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে যাবেন। স্বপনের মাথায় ব্যাণ্ডেজ দেখে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, বাস থেকে পড়ে গিয়ে সম্প্রতি আহত হয়েছিলেন। তবে ক্ষত সামান্য। ইতিমধ্যে সেরে গেছে। খেলার অভ্যাসের প্রশ্নে স্বপন বলেন, একটু জড়তা আসবে। তবে কয়েকদিনের প্র্যাকটিসে কাটিয়ে ফেলতে পারবেন।…

শিবশংকরের দৃষ্টিশক্তি এ বয়সেও পরিষ্কার। চশমা নিতে হয় না। বার বার পড়লেন খবরটা। তাঁর দুটো চোখ নিষ্পলক আর উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল ক্রমশঃ। কাগজটা ভাঁজ করে এদিক-ওদিক তাকালেন। সকালের রোদে চারদিক ঝলমল করছে। গঙ্গায় একটা বড় জাহাজ নোঙর করে আছে। কয়েকটা লঞ্চ, ট্রলার, এক ঝাঁক নৌকো ছবির মতো স্থির। মা অপালা, লক্ষ্য রাখিস স্বর্গ থেকে।

উঠে আস্তে আস্তে হেঁটে চললেন বাবুঘাটের দিকে! কিছু খেয়ে নেবেন। আর ফিরে যাবেন না কিরণের বাসায়! গঙ্গার ধারেই আপাততঃ আস্তানা। এখান থেকে ফোর্ট উইলিয়ামের উত্তরের মাঠ হয়ে গেলে ইলেভেন টাইগার্সের টেন্ট এবং স্টেডিয়াম নাক বরাবর এক কিলোমিটারও নয়। ওই তো দেখা যাচ্ছে গাছপালার আড়ালে। ঘাটের মাথায় ধর্মশালায় রাতের আস্তানা মন্দ হবে না। তাঁর মতো কত মূলছাড়া ভাসমান মানুষ এইভাবে বেঁচে আছে!

আনমনে ব্যাগে হাত ভরে ন্যায়দণ্ডটা একবার ছুঁলেন শিবশংকর!

ড্রইংরুমে অ্যাডভোকেট হরিসাধন দত্তকে বসিয়ে রেখে ষষ্ঠী ছাদে খবর দিতে গিয়েছিল কর্নেলকে। বিকেলের নরম আলোয় উদ্ভিদ জগতকে বিষণ্ণ দেখছিলেন যেন। ক'দিন থেকে এই একটা ব্যাপার হচ্ছে। মরুপ্রজাপতি দম্পতিকেও কেমন নির্জীব দেখাচ্ছে যেন। নিজেরই মনের প্রতিফলন। একটা দ্বিধা ক্রমশঃ চেপে বসছে। আইনের হাত যেখানে পৌঁছুতে পারে না, সেখানে হয়তো স্বয়ং ঈশ্বরের হাতই পৌঁছয়। ভুল করছেন না তো? জীবনে অসংখ্য নির্মম হত্যাকারীকে গভীর অন্ধকারের রহস্যজাল ছিঁড়ে খুঁজে বের করেছেন। তৃপ্তি পেয়েছেন। প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার জেগেছে মনে। কিন্তু এই কেসে বার বার তাঁর মনে হচ্ছে, ভুল করছেন না তো?

পকেট থেকে আবার অপালার কচি মুখের ছবিটা বের করলেন। সীমন্তকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন। ছবিটা বিকেলের ম্লান আলোয় দেখতে দেখতে আবার মনে হল, ভুল করছেন। কেন শিবশংকরকে নিয়ে তাঁর মাথা-ব্যথা। পুলিস তাঁকে খুঁজে বের করুক। কেন তিনি তাঁকে ফাঁদে ফেলার চক্রান্ত করে বসলেন?

হুঁ—স্বপনের জন্য। স্বপনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। শিবশংকর ধরা না পড়লে এবং তাঁর শাস্তি না হলে স্বপন নিরাপদ নয়।

হঠাৎ মনে হল, যদি শিবশংকরকে খুঁজে বের করতে পারেন, তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলেন, তাহলে কি তাঁকে নিবৃত্ত করা যাবে না? শিবশংকর তো আসলে একটা মানবিক মূল্যবোধের তাগিদেই হত্যাকারী হয়ে উঠেছেন—হতে বাধ্য হয়েছেন। মানবিক মূল্যবোধ ছাড়া আর কি? স্ত্রী এবং কন্যার শোচনীয় পরিণতি দেখে তাঁর বিচলিত হওয়ার কারণ তো ভালবাসা, স্নেহ মমতাবোধ, যা কিনা মানুষের শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ। উচ্চতম আদর্শ। সর্বকালে, সর্বসমাজে।

চঞ্চল হয়ে উঠলেন। যেভাবে হোক, শিবশংকরকে খুঁজে বের করতেই হবে। তাঁর মন থেকে স্বপনের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত ধারণা মুছে দিতে হবে! তারপর—

আপাততঃ পরের কথা ভেবে লাভ নেই। আগে শিবশংকরকে খুঁজে বের করা দরকার। ছবিটা পকেটে ঢুকিয়ে চুরুট ধরালেন কর্নেল।

সেই সময় ষষ্ঠী এসে খবর দিল, কালো কোটপরা পেল্লায় এক ভদ্রলোক এসেছেন। কর্নেল শান্তভাবে নেমে গেলেন। ডাইনিং রুমে স্বপন টি-ভি দেখছে। আগামীকাল থেকে সে ক্লাবে যাবে।

কর্নেলকে দেখে অ্যাডভোকেট দত্ত উঠে দাঁড়ালেন—গুড আফটারনুন কর্নেল স্যার!

কর্নেল বললেন—রেজাল্ট বলুন মিঃ দত্ত।

মিঃ দত্ত কপালের ঘাম মুছে বললেন—ওঃ! দশ বছরের পুরনো কোর্ট ডকুমেন্ট খুঁজে বের করা কি সহজ কথা? আর কিছুদিন হলেই মহাফেজখানায় চলে যেত। তবে ভাববেন না। পেয়েছি। রায়ের কপি এনেছি। এই দেখুন।

কর্নেল দলিলটা নিয়ে বললেন—অসংখ্য ধন্যবাদ মিঃ দত্ত।

—আপনার সেবা করতে পারলেই খুশী, স্যার! মিঃ দত্তপান এবং পোকায় খাওয়া লাল কালো দাঁতে হাসলেন।—তবে এ অন্য কেউ পারত না। ডিভোর্স স্যুট আমার একমাত্র প্রফেশন বলেই পারলুম! তার চেয়ে বড় কথা, এই কেসে আমিই ছিলুম অ্যাপ্লিকেন্টের ল-ইয়ার।

ষষ্ঠীকে ডেকে কফি দিতে বলে কর্নেল দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর বললেন—আপনিই মিসেস মৃদুলা গুপ্তের পক্ষে ছিলেন?

মিঃ দত্ত মাতৃভাষায় বললেন—হঃ। কৈলাম না, আমি স্পেশালিস্ট? যহন কৈলেন, তহন কিন্তু এক্কেবারে মনে আছিল না। বুঝলেন না? মাথার ভেতরটা ডিভোর্সে-ডিভোর্সে চার্জড হইয়া গেছে বেবাক! এই প্রফেশনের বিশ বছরে অ্যাট লিস্ট বিশ হাজার ক্যাস তো করছি!

খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগলেন আইনজীবী। ষষ্ঠী কফি আনল ঝটপট। কালো কোটপরা লোকটার প্রতি কোনো কারণে সে অপ্রসন্ন। হয়তো নিছক কালো কোটের জন্যই। চটজলদি বিদায় হলে তার অস্বস্তিটা কেটে যায়।

সে ইচ্ছে করেই কফিটা ঠাণ্ডা এনেছে। জল ফুটে ওঠার আগে কফি দিয়েছে। মিঃ দত্ত তার ফাঁদে পা দিতে দেরি করলেন না। কয়েক চুমুকে শেষ করে পকেট থেকে বিল বের করলেন।—বিলটা লন স্যার! পেমেন্ট যহন খুশী করেন। আমি উঠি।

কর্নেল বিলে চোখ বুলিয়ে অবাক হলেন। দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে অনেকগুলো আইটেম। মোট দুশো সাতান্ন টাকা পঁচানব্বই পয়সা মাত্র! শুধু একটা ঠিকানা জানার জন্য এত খরচ। বললেন—বসুন এক মিনিট।

ড্রয়ার থেকে চেকবই বের করে চেক লিখে দিলেন। মিঃ দত্ত বিগলিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন।—পুরান ক্যাস, বুঝলেন না স্যার? ঘুষঘাষ দিয়া তবে না—

—থ্যাঙ্ক্স্ মিঃ দত্ত।

—যহনই দরকার হইব, জাস্ট এট্টু রিং করবেন। হেয়্যাই তো আমার কাজ, বুঝলেন না?...

ষষ্ঠী মুখিয়ে ছিল। দরজা বন্ধ করে এসে বলল—কালো জিনিস, বাবামশাই, মোটেও ভাল নয়। কালো কাক, কালো কোট—

—তোর মাথাটাও তো কালো, বাবা!

ষষ্ঠী জিভ কেটে স্থানত্যাগ করল। কর্নেল আদালতের দলিল থেকে প্রতিবাদী শ্রীশিবশংকর গুপ্তের বাবার নাম আর ঠিকানাটা টুকে নিলেন। দশ বছর আগের ঠিকানা। নিশ্চয় ভাড়া বাড়ি। তবু একটা সূত্র তো। অন্ধকারে হাতড়ানোর চেয়ে এই সূত্রটা ধরে যতটা এগোনো যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে অপালার এক্সারসাইজ খাতায় ওর স্কুলের নামের অংশটা ছেঁড়া। নইলে স্কুলের সূত্রে এই ঠিকানাটা পাওয়া যেত বিনা খরচেই।

কর্নেল ঘড়ি দেখলেন। সাড়ে পাঁচটা বাজে। এখনই একবার ঘুরে আসবেন?